নাচের
পুতুল-৩
রোমেনা আফাজ

দস্যু বনহুর সিরিজ

# নাচের পুতুল (৩)-৭৮

রোমেনা আফাজ

সালমা বুক ডিপো

৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশক ঃ
মোঃ মোকসেদ আলী
সালমা বুক ডিপো
৩৮/২ বাংলাবাজার,
ঢাকা-১১০০



প্রচ্ছদ ঃ সুখেন দাস

নতুন সংস্করণ ঃ জুলাই ১৯৯৮ ইং

পরিবেশনায় ঃ
বাদল ব্রাদার্স
৩৮/২ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
বিশ্বাস কম্পিউটার্স
৩৮/২-খ, বাংলাবাজার,
ঢাকা-১১০০

মুদ্রণে ঃ
সালমা আর্ট প্রেস
৭১/১ বি. কে. দাস রোড
ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১১০০

দাম ঃ ত্রিশ টাকা মাত্র

উৎসর্গ

আমার প্রাণ প্রিয় স্বামী, যিনি আমার লেখনীর উৎসাহ ও প্রেরণা জুগিয়েছেন আল্লাহ রাব্বিল আলামিনের কাছে তাঁর রুহের মাগফেরাৎ কামনা করছি।

আমেনা আফাজ
জলেশ্বরী তলা
বগুড়া

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

# দস্যু বনহুর

❑

টেবিলে মাথা রেখে বসেছিলো পাগলটা। একটা ডিমলাইট জ্বলছে। দেয়াল ঘড়িটায় শব্দ হচ্ছে টিক্ টিক্.........

হঠাৎ দরজা খুলে গেলো।

কক্ষমধ্যে কেউ প্রবেশ করলো বলে মনে হলো। ইতিপূর্বে কয়েকবার কয়েকজন এসেছে, পাগলটাকে পোশাক পরিবর্তনের জন্য তারা পীড়াপীড়ি করেছে, খাবারও এনেছিলো তারা কিন্তু পাগল খায়নি।

এবার পদশব্দটা পূর্বের মত নয়।

কেউ যেন লঘু পদক্ষেপে সেই কক্ষে প্রবেশ করে এগিয়ে আসছে।

পাগল মাথা তুলে তাকালো।

ততক্ষণে দিপালী এসে দাঁড়িয়েছে তার সম্মুখে। পাগলটা চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে স্থির দৃষ্টি মেলে। যাকে ছিন্নভিন্ন মলিন বসনে, দুর্গন্ধযুক্ত দেহে দেখছিলো এখন সেই তরুণী সম্পূর্ণ যেন পাল্টে গেছে। পাগলের চোখেমুখে ফুটে উঠে বিস্ময়ভরা ভাব।

শুধু তাকিয়ে থাকে সে, কোনো কথা বলে না।

দিপালীর হাতে পরিস্কার জামাকাপড়। সেও কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে পাগলের মুখের দিকে, তারপর বলে—তুমি আমাকে চিনতে পারছো না?

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে পাগল, অস্ফুট কণ্ঠে বলে—না না, আমি তোমাকে চিনি না।

দিপালীর দু'চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে এলো। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললো দিপালী, তোমার একি চেহারা হয়েছে বলতো? ওর কাঁধে হাত রাখে সে।

পাগল বসেছিলো উঠে দাঁড়ায়, ওর হাতখানা সরিয়ে দিয়ে বলে— কে তুমি? তোমাকে আমি চিনিনা।

আমার দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখতো চিনতে পারো কিনা?

না।

বেশ নাইবা চিনলে, নাও ঐ নোংরা জামাকাপড় খুলে পরিস্কার জামাকাপড় পরে নাও দেখি।

ওসব আমি পারবো না।

তবে তোমাকে সিগারেট দেবো না।

আমার মোহর আছে, অনেক মোহর। তোমাকে মোহর দেবো, তুমি তাহলে আমাকে সিগারেট দেবে?

[illegible] না দেবো না।

মোহর দিলেও তুমি সিগারেট দেবে না?

না।

তবে ঐ পরিস্কার জামাকাপড় পরলে দেবে?

হাঁ দেবো। খোলো ঐ ময়লা জামাকাপড়।

বেশ তাহলে খুলছি......পাগল জামা খুলে ফেলে।

দিপালী ওকে নিজের হাতে পরিয়ে দেয় জামা। তারপর বাথরুম দেখিয়ে বলে—ওর মধ্যে গিয়ে পরে এসো এই পাজামাটা।

দিপালী রাজকুমার জ্যোতির্ময়কে তুমি বলেই সম্বোধন করে চলে। জ্যোতির্ময়ের আসল পরিচয় দিপালী জানতো বলেই সে তাকে আপনি বলে সম্বোধন করছিলো প্রথমে কিন্তু পরে তাকে তুমি বলে।

পাগল দিপালীর কথা শুনে পাজামা হাতে বাথরুমে প্রবেশ করে, তারপর এক সময় বেরিয়ে আসে সে।

দিপালী বলে উঠে—বাঃ চমৎকার হয়েছে।

পাগল দিপালীর সম্মুখে এসে হাত পাতে—কই, দাও সিগারেট দেবে বলেছিলে না?

দেবো কিন্তু এখন নয়।

তবে কখন দেবে?

যখন তুমি খাবার খাবে তখন দেবো।

দিপালীর পিছনে একটা ট্রের উপরে এক গেলাস দুধ আর কিছু খাবার নিয়ে একটি লোক দাঁড়িয়েছিলো। দিপালী তার হাত থেকে ট্রেটা নিয়ে নামিয়ে রাখে টেবিলে, তারপর ওর হাত ধরে বলে—নাও রাজকুমার, এবার খাও দেখি।

পাগল মুখ ফিরিয়ে নিলো—না আমি খাবো না, আগে সিগারেট দাও।

সত্যি সিগারেট দিলে তারপর খাবে?

হাঁ খাবো।

দিপালী লোকটাকে লক্ষ্য করে বলে—যাও ওর জন্য সিগারেট নিয়ে এসো।

লোকটা চলে যায়।

এতক্ষণ আড়ালে দাঁড়িয়ে ইমরান ও রশিদ হায়দার সব দেখছিলো।

লোকটা বেরিয়ে আসতেই বলে ইমরান—কিরে কি হলো?

মালিক, অনেক বলে কয়ে পাগলাটা জামা-পাজামা পাল্টে পরেছে কিন্তু খাচ্ছে না।

কেন?

বলছে সিগারেট না দিলে খাবে না।

এই কথা, নিয়ে যা কত সিগারেট ও চায় তাই ওকে দে।

লোকটা চলে যায়।

ইমরান ও রশিদ হায়দার চলে যায় তাদের কাজে। ওরা নিশ্চিন্ত যে, এবার দিপালী তাদের আয়ত্তে এসে যাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

যে দিপালীকে তারা দীর্ঘ সময় ধরে নানাভাবে নির্যাতন করেও তাদের কাজে সহায়তায় এগিয়ে আনতে পারেনি, সেই দিপালী হঠাৎ এত সহজে স্বাভাবিক আকার ধারণ করলো ওরা যেন এতটা ভাবতে পারেনি। খুশি হয়েছে রশিদ হায়দার; ইমরানকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। চলতে চলতে বললো রশিদ হায়দার—ইমরান, তুমি বড় কাজের লোক।

সে কথা বুঝি এতদিনে বুঝলেন সাহেব?

না, বুঝেছি অনেক দিন! ব্যবসা তো আমাদের আজকের নয়। তবে পূর্বে ছোটখাটো ছিলো এখন বেশ বড় হয়েছে। তখন অংশীদার হিসেবে ছিলো হিম্মৎ খাঁ এবং আরও কয়েকজন।

জানি সাহেব, সবাইর নাম আমি জানি। অবশ্য এরা না থাকলে আপনার ব্যবসা এত দিন এভাবে ফেঁপে উঠতো না।

আমাদের মানে তোমার এ ব্যবসা নয় ইমরান?

আমারও তো বটে কিন্তু হাজার হলেও আপনরা ব্যবসার মালিক আর আমি মাইনে করা চাকর।

চাকর! চাকর তুমি নও ইমরান, তুমি এখন থেকে আমাদের ব্যবসার একজন অংশীদার।

কারণ আমি না হলে......

হাঁ, তুমি না হলে আমরা এমন শান্তিমত ব্যবসা চালাতে পারবো না। জানোতো দস্যু বনহুর আমাদের কত সর্বনাশ করেছে।

জানি! দস্যু বনহুর হিম্মৎ খাঁকে হত্যা করে যা ক্ষতি সাধন করেছে তা কোনোদিনই পূর্ণ হবার নয়। তাছাড়া কয়েকজন মহান ব্যক্তিকে সে হত্যা করেছে যারা সর্বান্তকরণে সহায়তা করতেন।

ঠিক বলেছ ইমরান তাঁদের নাম আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। এঁরা যদিও ছিলেন সরকার পক্ষের লোক কিন্তু আসলে তাঁরা আমাদেরই দলভুক্ত ছিলেন। কি সুন্দরভাবে জনগণকে খুশি রেখে জনগণের চোখে ধুলো দিয়ে তাদের সঞ্চিত খাদ্যশস্য কৌশলে আমাদের হাতে তুলে দিতেন........রশিদ হায়দারের কণ্ঠ ধরে আসে।

ইমরান এবার বলে—হায়দার আলী সাহেব, আমি সব জানি এবং এ ব্যাপারে আমিও খুব দুঃখিত।

শুধু তাই নয় ইমরান, দস্যু বনহুর আমাদের আরও কয়েকজনকে হত্যা করেছে। তারা ছিলো আমাদের কাজের লোক। তাছাড়া বহু অর্থ আর মূল্যবান সামগ্রী সে নিয়ে গেছে, যার ক্ষতির পরিমাণ কোটি কোটি টাকারও বেশি।

ইমরান তুমিই এখন আমাদের একমাত্র ভরসা। নতুন কৌশলে নতুনভাবে তুমি কাজ করে চলেছো এজন্য আমরা তোমার উপর অত্যন্ত খুশি আছি। ইমরান, তুমি যা চাও আমরা তাই দিতে রাজি আছি।

ইমরান এবং রশিদ হায়দার ফিরে এলো যে কক্ষমধ্যে বসে তারা কিছু পূর্বে আলাপ-আলোচনা করছিলো সেই কক্ষে। আসন গ্রহণ করে বলে হায়দার আলী—ইমরান, পুলিশ মহলের বাড়াবাড়ি যেন চরমে উঠেছে। এরা আমাদের কারবার বন্ধ করে দেবার উপক্রম করেছে।

হায়দার আলী সাহেব, এ কারণেই আমি পুলিশ মহলের কর্মচারীদের শায়েস্তা করতে শুরু করেছি। প্রতিদিন একজন না একজনকে ক্ষুধার্ত কুকুরের দ্বারা হত্যা করে তার মৃতদেহ শহরের বিভিন্ন স্থানে ফেলে দিয়ে আসছি।

সাবাস ইমরান, এমন লোক না হলে চলে! ইমরান আলী?

বলুন?

জানো এবার কেন এলাম?

তা কেমন করে জানবো সাহেব?

চল্লিশ হাজার মণ চাল গুদামে তুলেছি। এ চাল আমি কোথায় পেয়েছি জানো—বিদেশ থেকে রিলিফ হিসেবে এসেছিলো।

সে চাল আপনি কি করে......

কি করে পেলাম, এইতো?

আপনি না বললেও আমি জানি কিভাবে কোথা থেকে এ চাল আমদানী করেছেন।

তাহলে সব তুমি জানো, সব তুমি খোঁজ রাখো?

আপনার সঙ্গে ব্যবসায় যখন অংশীদার হিসেবে কাজ করছি তখন সব খবরই রাখতে হয়। চাউল আপনি কিভাবে গুদামে ভরলেন সে সংবাদও আমি পেয়েছি। হায়দার আলী সাহেব এবার চালগুলো কি করতে চান?

সে কথাই তোমাকে জানাতে এসেছি ইমরান। আগামীকাল এ চাল আমি পার করে দিতে চাই। গাড়ির সঙ্গে যাবে তুমি।

বেশ আমি রাজি আছি। কিন্তু কত টাকা এ ব্যাপারে দেবেন সাহেব? কথাটা অবশ্য আগে থেকে শুনে রাখা দরকার।

যা পাবে তাতো অংশীদার হিসেবে ব্যবসার অংকে জমাই হবে.......

তবু জেনে রাখতে চাই।

খুব বেশি হয়তো অংশ পড়বে না, কারণ শুধু তুমি আর আমিইতো নই, আরও যারা আছেন তাঁরা পাবেন কিনা। যেমন ধরো রিলিফ প্রধান যিনি রিলিফের চালগুলো কৌশলে জনগণের দৃষ্টি এড়িয়ে আমাদের গুদামে পাচার করলেন, তিনি পাবেন মোটা অংশ। তারপর যারা তাঁকে সহায়তা করেছেন তাঁরা পাবেন কিছু কিছু........এমনি ধরনের অংশ হিসেবে টাকাটা ভাগ হবে। তবে তুমি ঠকবে না ইমরান, ঠকবে না। প্রস্তুত থেকো, কাল তোমাকে যেতে হবে।

ইমরান একটু চুপ থেকে বললো—রাতেই যেতে হবে, না দিনে।

রাতের কারবার আমি পছন্দ করি না ইমরান। আমার কাজ সব দিনের আলোতে। চালগুলো আমি এমনভাবে বাইরে পাঠাচ্ছি, যাতে কেউ কোনো সন্দেহ করতে না পারে।

কি রকম?

লোকে মনে করবে রিলিফের চালগুলো সব দুর্গত এলাকায় বণ্টনের জন্য যাচ্ছে। গাড়িগুলোর সঙ্গে থাকবে রিলিফ প্রধানের রিসিট যাতে কেউ ভুল করেও গাড়ি স্পর্শ না করে।

হায়দার আলী সাহেব, এর চেয়ে ভাল বুদ্ধি রিলিফ দ্রব্য জাহাজ থেকে খালাস করবার পূর্বে হস্তান্তর করা। কেউ বুঝতেও পারবে না এতো মাল কেমন করে এলো আর কোথাইবা গেলো।

ইমরান, আমাকে তুমি জানোনা। আমার এ ব্যবসা অনেক দিনের। তবে রিলিফ দ্রব্যের আমদানি পূর্বে ছিলোনা।

শুধু রিলিফ দ্রব্যই নয়, যে কোনো চোরাচালানী ব্যবসাই ছিলো স্তিমিত, অত্যন্ত লঘু। আজকাল এ সব ব্যবসা যেমন ফেঁপে উঠেছে, আমরা এখন যেমন দু'চার পয়সার মুখ দেখছি এমনতো আর পূর্বে ছিলো না।

ছিলো না তবু আমরা কম পয়সা রোজগার করিনি ইমরান। এখন যেমন আমাদের ব্যবসা সহজ হয়েছে তখন এত সহজ ছিলো না এই যা। যাক ওসব কথা, এবার কাজের কথায় এসো।

মাল নিয়ে তুমি যাবে, পথে কোনো বাধা আসবে না কারণ তোমার হাতে থাকবে উপরওয়ালার হাতের লেখা চিঠি। কোনো ব্যাটা তোমার কেশ স্পর্শ করবে না বা করতে পারবে না।

বেশ, আমি রাজি আছি। কিন্তু রাজকুমার জ্যোতির্ময় হবে আমার সম্পদ। আমি তাকে আটক রেখে একশতটি স্বর্ণমোহর দাবী করবো।

বেশ, তাই হবে কিন্তু দিপালীর উপর যেন তুমি লোভ করোনা ইমরান।

হেসে উঠে ইমরান—এতদিন আপনি মিস দিপালীকে ভোগ করে এসেছেন, তবু আপনার সখ মেটেনি হায়দার সাহেব। তবে কথা দিচ্ছি, আমি আপনার জিনিস কেড়ে নেবো না কিন্তু.........

বলো থামলে কেন?

ইচ্ছামত তাকে ব্যবহার করতে পারবো তো?

সেটা আমি বিবেচনা করে দেখবো।

আমি যাকে কৌশলে কাজের উপযোগী করে তুলছি তাকে ইচ্ছামত গ্রহণ করতে পারবো না?

দেখো একটুতেই অভিমান বা রাগ করো না। সব পাবে, সব হবে বন্ধু, সব হবে.........

হঠাৎ ইমরান ও হায়দার আলীর কানে ভেসে আসে একটা অট্টহাসির শব্দ। চমকে উঠে ওরা দু'জন, চমকে উঠে সরাইখানার অন্যান্য সবাই।

ছুটে আসে একজন লোক—মালিক, মালিক, পাগলটা বড় ক্ষেপেছে। সমস্ত খাবার ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। সে বেরিয়ে এসেছে তার ঘর থেকে.........

বলো কি ইমাম আহমদ? বললো হায়দার আলী।

ইমাম আহমদ নামক লোকটা হাঁপাতে হাঁপাতে বললো—এদিকেই ছুটে আসছিলো পাগলটা কিন্তু.........

বলো কিন্তু কি?

আমাদের লোকজন তাকে দেখতে পেয়ে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। সমস্ত খাবার ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে আর.........

আর কি করেছে বলো?

দিপালীকে মেরেছে।

দিপালীকে মেরেছে! ইমরানের চোখ দুটো জ্বলে উঠলো যেন, সে দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে দেয়াল থেকে জমকালো চাবুকটা খুলে নিলো সরাৎ করে, তারপর বললো—হায়দার আলী সাহেব, কেমন করে পাগলকে বশে আনতে হয় আমি জানি।

হায়দার আলী বলে—ঠিক বলেছো ইমরান। পাগলের এত বড় সাহস সে দিপালীর গায়ে হাত তুলে।

ওরা দু'জন দিপালীর কক্ষ অভিমুখে।

ততক্ষণে পাগলটাকে দু'জন ধরে নিয়ে গেছে পুনরায় সেই কক্ষে।

ইমরান আর হায়দার আলী এসে উপস্থিত হলো। যেন দু'জন অগ্নিবর্ণ ধারণ করে এসেছে। কটমট করে তাকিয়ে দেখলো অদূরে মেঝেতে বসে দিপালী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

সমস্ত মেঝেতে বাসনকোসন আর খাবার ছড়িয়ে আছে।

দু'জন লোক ধরে আছে পাগলটাকে।

পাগল আপন মনে হাসছে, সেকি ভীষণ ভীষণ তীব্র হাসির আওয়াজ।

ইমরান ও রশিদ হায়দার কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত কিছুক্ষণ দাড়িয়ে এ দৃশ্য লক্ষ্য করলো। তারপর ইমরানকে উদ্দেশ্য করে বললো— চালাও চাবুক! দিপালীকে ও মেরেছে, তার শাস্তি দাও।

ইমরান চাবুক খুলে নিলো হাতের মুঠায়। চিৎকার করে বললো—পাগল, তুমি জানোনা কোথায় এসেছো?

চাবুক উঁচু করে ধরতেই দিপালী ছুটে এসে পাগলটাকে আড়াল করে দাঁড়ালো—না না, ওকে মেরোনা, ওর চেয়ে আমাকে মারো তোমরা।

ইমরানের চাবুক শূন্যে থেমে গেলো। আগের দিন হলে ঐ চাবুক শূন্যে থেকে না গিয়ে দিপালীসহ পাগলটার দেহে গিয়ে পড়তো, কিন্তু এখন কেন যেন ইমরান বড় দয়ালু হয়ে পড়েছে।

দাঁতে দাঁত পিষে বললো—সরে যাও দিপালী, ওকে মারতে দাও। ভেবেছিলোম স্নেহ-আদরে ও সাধু বনে যাবে। কিন্তু তা হলো না। খাবার খাওয়া দূরের কথা, সে তোমার উপর হাত তুলেছে।

শোনো আমি কথা দিচ্ছি ওকে যেমন করে হোক আমি সাধু বানাবো। তোমরা আমাকে সময় দাও। ও খায়নি সেটা আমারই দোষ। ও আমাকে মেরেছে সেও আমার অপরাধ।

এবার বললো রশীদ হায়দার—তুমি বুঝি ওর প্রেম নিবেদন উপেক্ষা করেছিলে?

দিপালীর সমস্ত দেহ রাগে গস্ গস্ করলেও নিজকে সামলে নিয়ে বললো—খাবার পূর্বে ও সিগারেট চেয়েছিলো আমি দেইনি তাই........

তাই তোমাকে মারবে এতবড় সাহস ওর?

বললো রশীদ হায়দার।

দিপালী বললো— তোমরা জানো না পাগলের কোন জ্ঞান থাকে না? সাহস ওর সর্বক্ষণ রয়েছে। তোমরা যাও আমি ওকে খাইয়ে ঘুম পাড়াবো।

ইমরান বললো—না যাবো না, আমার সম্মুখে ওকে খেতে দাও। যদি না খায় তবে চাবুক দিয়ে পিটিয়ে চামড়া তুলে নেবো।

না তা হয় না, তোমরা যাও। যা চাইবে আমি তোমাদের জন্য তাই করবো তবু আমার রাজকুমারকে তোমরা মেরো না।

হাঃ হাঃ হাঃ রাজকুমার। কে...কে তোমার রাজকুমার? কথাগুলো বলে হাসে পাগল। খরবদার আর এসো না, আমি তোমাকে আবার মারবো.........

দিপালী এরপর তুমি ওর কাছে যেতে পারবে? বললো রশীদ হায়দার।

বললো দিপালী—পারবো। তারপর দিপালী আঁচল থেকে খুলে বের করে তিনটা মোহর, মোহরগুলো ইমরান ও রশীদ হায়দারের হাতে দিয়ে বলে—এগুলো পাগল আমাকে দিয়েছে।

দু'জন নরশয়তানের চোখ জ্বলে উঠে মোহরগুলো দেখে। ওদের চোখের সম্মুখে ভেসে উঠে মোহরের স্তূপ। কোনোক্রমে যদি রাজকুমার জ্যোতির্ময়কে হাত করতে পারে ওরা, তাহলে মোহরের স্তূপ আসবে তাদের হাতের মুঠায়।

উভয়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে বেরিয়ে যায় সেই কক্ষ থেকে। যাবার সময় বলে যায় ইমরান—দিপালী, রাজকুমারকে বাগে আনতে চেষ্টা করো নাহলে বুঝতেই পারছো এ চাবুক দিয়ে তাকে বাগে আনা হবে।

দিপালী নীরবে মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানালো।

ওরা বেরিয়ে যেতেই লোক দুজনও বেরিয়ে গেলো, যারা পাগলকে ধরে এনেছিলো বাইরে থেকে।

দিপালী ওদের একজনকে বলেছিলো, এর জন্য খাবার নিয়ে এসো।

চলে গেলো ওরা।

দিপালী পাগলের পিঠে হাত বুলিয়ে বললো—নিষ্ঠুর, এমনি করে আমাকে মারলে? কিছু খেলেনা? বেশ, না খেলে আমিও খাবো না। জানো কতদিন হলো আমি উপবাসী?

ধীরে ধীরে মুখ ফিরিয়ে দিপালীর দিকে তাকালো পাগল। তীব্র কটাক্ষে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ, তারপর বললো— কে তুমি?

আমাকে তুমি চিনতে পারোনি? আমি দিপালী। জানো এরা আমায় বন্দী করে রেখেছে। এই দেখো আমার দেহে কত ক্ষত। রোজ ওরা আমার উপর নির্যাতন চালায়।

পাগল নীরব।

শুধু সে চেয়ে থাকে, কোনো কথা বলে না।

লোকটা খাবার নিয়ে আসে।

দিপালী খাবার থালাটা হাতে নিয়ে বলে—তুমি যাও, আমি ওকে খাওয়াচ্ছি।

লোকটা চলে যায়।

দিপালী খাবার থালা হাতে নিয়ে পাগলের সম্মুখে এসে দাঁড়ায়— এবার খাও।

না, আমি খাবো না।

এই নাও তোমরা সিগারেট। দিপালী কাপড়ের নীচ হতে বের করে এক প্যাকেট মূল্যবান সিগারেট।

পাগলের চোখ দুটো খুশিতে ঝলমল করে উঠে, হাত পেতে সে সিগারেটের প্যাকেট নেয়।

দিপালী বলে—খাও।

এবার পাগল খায়।

দিপালীর খুশি ধরেনা।

খাওয়া হলে ওকে বলে—এবার এসো বিছানায় শোবে।

পাগল কোনো আপত্তি করে না, নীরবে শয্যা গ্রহণ করে।

দিপালী বুঝতে পারে পাগল অত্যন্ত ক্লান্ত তাই নীরবে সে শয্যা গ্রহণ করলো। দিপালী ওর দেহে চাদর টেনে দেয়, চুলে হাত বুলিয়ে দেয় সে ওর।

এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে পাগল।

দিপালী ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়, নির্বাক নয়নে তাকিয়ে থাকে সে কিছুক্ষণ ওর মুখের দিকে, তারপর চলে যায় নিজের ঘরে।

ইমরান ও রশীদ হায়দার আড়ালে আত্মগোপন করে সব দেখে।

দিপালী নিজের কক্ষে চলে যেতেই বলে রশীদ হায়দার— ইমরান, তোমার বুদ্ধির তারিফ না করে পারি না। কতদিন ধরে আমি দিপালীকে বশে আনবার চেষ্টা করেছি কিন্তু তাকে কিছুতেই বশে আনতে পারিনি।

আর আমি দেখুন সহজেই ওকে কাজের মেয়ে করে তুলেছি। আজ তো সবে শুরু এরপর দেখবেন কেমন করে ডুবরী দিয়ে মুক্তো তুলতে হয় তাও করবো।

হাঁ ঠিক বলেছো ইমরান, দিপালী ডুবুরি আর পাগলটা মুক্তো।

হাসলো ওরা দু'জন একসঙ্গে।

❑

মোহসিন চিন্তিতভাবে পায়চারী করে চলেছে। সমস্ত মুখমন্ডল তার গম্ভীর থমথমে। দেহের জামা ঘামে ভিজে চুপসে উঠেছে। ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে ভীষণ উদ্বিগ্নতার সঙ্গে সময় কাটাচ্ছে।

আরও কয়েকজন অনুচর দাঁড়িয়ে আছে একপাশে।

কক্ষটা নীরব।

অন্যান্য অনুচরের মুখেও দুশ্চিন্তার ছাপ।

কক্ষের দেয়ালে দপ্ দপ্ করে মশাল জ্বলছে।

এমন সময় ভারী বুটের শব্দ হলো।

চম্‌কে ফিরে তাকালো সবাই।

মোহসিন বলে উঠলো—সর্দার।

বনহুর কাঁধ থেকে নামিয়ে রাখলো দিপালীর সংজ্ঞাহীন দেহটা মেঝের একপাশে।

বনহুরের অনুচরগণ সবাই বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে আছে।

বনহুর বললো— মোহসিন, দিপালীকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছি কিন্তু সেই নরপশু শয়তানদের এখনও সায়েস্তা করা বাকি আছে। মোহসিন, তুমি শিগ্‌গির দিপালীকে বিশ্রামকক্ষে নিয়ে যাও এবং ওকে যত্ন সহকারে

বিছানায় শুইয়ে দাও। যতক্ষণ সংজ্ঞা ফিরে না আসে ততক্ষণ ওর পাশে যেন কেউ থাকে, বলে দিও।

আচ্ছা সর্দার। মোহসিন দিপালীর সংজ্ঞাহীন দেহটা তুলে নিয়ে চলে গেলো।

বনহুর একটা আসনে বসে তাকালো তার অন্যান্য অনুচরদের মুখের দিকে। বুঝতে পারলো সে তার বিলম্বেই অনুচররা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলো।

অল্পক্ষণেই ফিরে আসে মোহসিন।

বনহুর বললো—শোন মোহসিন, আজ দিবাগত রাত চারটায় তোমরা বেশ কয়েকজন হিন্দল সুড়ঙ্গমুখে অপেক্ষা করবে। কয়েক গাড়ি চাল ঐ পথে দেশের বাইরে পাচার হয়ে যাচ্ছে। সেই চালের গাড়িগুলো আটক করে সমস্ত চাল দুঃস্থ হিন্দল অধিবাসীদের মধ্যে বিতরণ করে দেবে।

একজন অনুচর বলে উঠে—সর্দার, হিন্দল সুড়ঙ্গের নিকটে যারা বাস করে তারা সবাই নিগ্রো এবং জংলী।

একটু হেসে বলে বনহুর—তবু তারাও মানুষ! মোহসিন, সব গুছিয়ে নিয়ে যাবে যেন বিফল না হও।

কথাগুলো বলে বনহুর উঠে দাঁড়ালো। তারপর বেরিয়ে গেলো সে আস্তানা থেকে।

মোহসিন অনুচরদের প্রস্তুত হতে বলে পা বাড়ালো দিপালীর কক্ষের দিকে।

কক্ষমধ্যে প্রবেশ করেই থমকে দাঁড়ালো মোহসিন। দিপালীকে সে দেখেনি কোনদিন, শুধু ওর সম্বন্ধে শুনেই এসেছে। মোহসিন জানে, দিপালী একটা বড় হোটেলে নর্তকী ছিলো কিন্তু মোহসিন আজ ওকে দেখে অবাক না হয়ে পারলো না। দিপালীর চেহারা এবং তার পোশাক দেখে মনে হয় না সে কোনো নর্তকী বা ঐ ধরনের মেয়ে।

সুন্দরী বটে দিপালী।

মোহসিন নির্ণিমেষ নয়নে তাকিয়ে আছে ওর মুখের দিকে। কক্ষমধ্যে যে ছিলো মোহসিন এসে দাঁড়াতেই সে বেরিয়ে যায় বাইরে।

মোহসিন আরও সরে আসে দিপালীর বিছানার পাশে। দিপালীকে ওর বড় ভাল লাগে, ওর মনে হয় দিপালী যেন তার অনেক পরিচিত।

ভেবে পায়না মোহসিন ওকে তার কেন এত ভাল লাগছে কই, পূর্বেতো কোনদিন সে দিপালীকে দেখেনি। বনহুর যখন বলেছিলো— মোহসিন, ওকে নিয়ে যাও বিশ্রাম কক্ষে নিয়ে শুইয়ে দাও। যত্নের যেন কোনো ত্রুটি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখো।

বনহুরের আদেশে মোহসিন যখন ওকে হাতের উপর তুলে নিয়েছিলো তখন হৃদয়ে একটা আলোড়ন অনুভব করেছিলো সে, একটা অনুভূতি তার সমস্ত শরীরে শিহরণ জাগিয়েছিলো। মোহসিন অবিবাহিত যুবক। যদিও তার বয়স খুব কচি বা কম নয় তবু সে এখনও কোন নারীর সংস্পর্শে আসেনি, হয়তো সেই কারণেই এত ভাল লেগেছে তার। দিপালীকে।

দিপালীর মুখে স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দাঁড়িয়েছিলো মোহসিন। দেয়ালে গোঁজা মশালটা জ্বলছে। কক্ষ নীরব নিস্পন্দ।

মোহসিন দিপালীর গন্ড স্পর্শ করার জন্য হাত বাড়ায়, বড় লোভ হয় ঐ সুন্দর কোমল গন্ডে হাত রাখতে কিন্তু সাহস হয় না, হাতখানা সরিয়ে নেয় সে সতর্কতার সঙ্গে। যদি কেউ দেখে ফেলে, যদি সে সর্দারের কাছে বলে দেয় তাহলে তাকে চরম শাস্তি পেতে হবে। সর্দার তাকে কিছুতেই ক্ষমা করবে না।

মোহসিন দৃষ্টি ফিরিয়ে বেরিয়ে যাবার জন্য পা বাড়ায়।

ঠিক ঐ মুহূর্তে দিপালী শব্দ করে—উঃ মাগো, পা...নি...

মোহসিন থমকে দাঁড়িয়ে ফিরে তাকায়, দেখতে পায় দিপালী চোখ মেলে তাকিয়েছে। সে মাথাটা বালিশে এপাশ-ওপাশ করছে।

মোহসিন এগিয়ে এসে বলে—আপনি চুপ করে শুয়ে থাকুন, বেশি নড়াচড়া করবেন না।

দিপালী চোখ মেলে ভালভাবে তাকায়। মোহসিনের চেহারা তাকে বিস্মিত করে, কারণ ওকে তো সে দেখেনি কোনোদিন। বলে দিপালী—কে তুমি? আমি এখন কোথায়?

মোহসিন বললো—আপনি ভাল জায়গায় আছেন। আমি একজন মানুষ।

দিপালী আশ্চর্য হয়, কি করে সে এখানে এলো আর এই লোকটাই বা কে? দিপালী চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে—এটা তো সেই সরাইখানা নয়। দেয়ালে মশাল জ্বলছে, কক্ষটাও স্বাভাবিক বা সাধারণ কক্ষ নয়। পাথুরে দেয়াল—দেয়ালের স্তরগুলো মসৃণ বা সমতল নয়, কেমন যেন এবড়োথেবড়ো। কক্ষের ছাদটাও নতুন ধরনের কঠিন পাথরে তৈরি, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ধীরে ধীরে মনে পড়ে, সে তো তার নির্দিষ্ট কক্ষে ঘুমাচ্ছিলো। তার রাজকুমার জ্যোতির্ময়, সে যে পাশের আর একটি কক্ষে ঘুমিয়েছিলো। তার কথা মনে পড়তেই দিপালী উঠে বসে, তারপর দ্রুত নেমে দাঁড়ায়—রাজকুমার...আমার রাজকুমার কোথায়?

মোহসিন বলে—কে আপনার রাজকুমার?

সে যে পাশের ঘরে ঘুমিয়েছিলো। আমি কিছু বুঝতে পারছি না। আমি এখন কোথায় তাও জানি না। তোমরা আমাকে কেন এখানে এনেছো? আমার রাজকুমারকে এনে দাও।

মোহসিন স্তম্ভিত হতবাক হয়ে যায়। সে কিছুতেই দিপালীকে শান্ত রাখতে পারে না। বলে—দেখুন, আপনি ভাল জায়গায় আছেন, আপনার কোনো অসুবিধা হবে না।

কিন্তু কেনো তোমরা আমাকে এখানে এনেছো? আমার রাজকুমারকে ছেড়ে আমি বাঁচতে পারবো না। আমাকে যেতে দাও।

না, আপনাকে যেতে দেবো না। আপনি অসুস্থ, আপনার বিশ্রামের প্রয়োজন।

দিপালীকে বোঝাতে চেষ্টা করে মোহসিন।

❑

বনহুর তখন কান্দাই আস্তানা অভিমুখে রওয়ানা দিয়েছে। ভোর হবার পূর্বে তাকে কান্দাই জঙ্গলে পৌঁছতে হবে। হিন্দল সুড়ঙ্গমুখে একটি গভীর খাদ তৈরি করে গাড়িগুলোকে ঐ খাদের মধ্যে লুকিয়ে রাখতে হবে, তারপর হিন্দল অধিবাসীদিগকে সংবাদ দিয়ে চালগুলো বিতরণ করে দিতে হবে।

বনহুর কান্দাই আস্তানায় পৌঁছতেই তার অন্যান্য অনুচরসহ কায়েস এসে উপস্থিত হলো। সবাই যেমন আনন্দিত তেমনি বিস্মিত হয়েছে সর্দারের আগমনে, কারণ সর্দার জম্বু গিয়েছে, তার কাজ এখনও শেষ হয়নি, হলেই চলে আসবে এইটুকু জানে তারা।

পিতাকে দেখে ছুটে গেলো জাভেদ তার মাকে সংবাদ দিতে।

নূরী তখন নির্জন ঝরণার ধারে বসে বসে জংলী রাজহাঁসগুলোকে খেতে দিচ্ছিলো। নির্জন ঝরণাধারে বসে বসে বার বার মনে পড়ছিলো আজ বনহুরের কথা? কতদিন হলো সে নেই, কিছুই যেন ভাল লাগে না তার।

সহসা শুনতে পেয়েছিলো অশ্বের খুরের শব্দ। মনটা তার আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠেছিলো—এ শব্দ তার অতি পরিচিত —তাজের খুরের শব্দ।

কিন্তু একটা দারুণ অভিমান তাকে স্থবির করে ফেলেছিলো—না, কিছুতেই সে যাবে না। যতক্ষণ হুর না আসবে কিছুতেই সে যাবে না। যতক্ষণ হুর না আসবে তার কাছে ততক্ষণ সে এখানেই বসে থাকবে।

জাভেদ এসে ডাকলো—আম্মু আম্মু, তুমি এখানে, এসো আব্বু এসেছে।

না, আমি যাবো না।

কেন, কেন যাবে না আম্মু?

তুই যা তোর আব্বুর কাছে, আমি যাবো না।

বেশ আমি চলে যাচ্ছি, আব্বু এসে তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে। জাভেদ চলে যায়।

বনহুর দরবারকক্ষে প্রবেশ করে অনুচরদের কাজের নির্দেশ দেয়। কিছুসংখ্যক অনুচর গিয়ে হিন্দল সুড়ঙ্গমুখের অদূরে একটি গভীর ঢালু পরিখা খনন করে রাখবে। কিভাবে পরিখা খনন করবে, এ ব্যাপারে বুঝিয়ে বলে এবং একটি ম্যাপ এঁকে দেয় বনহুর অনুচরদের কাছে। কোন্ পথে তারা অগ্রসর হয়ে হিন্দল যাবে এবং কিভাবে কোন্ স্থানে পরিখা খনন করা হবে, সবকিছুর নির্দেশ থাকে সেই ম্যাপ খানাতে।

অনুচরগণকে পাঠানোর ব্যাপারে ব্যস্ত থাকায় বনহুর ভুলে যায় নূরীর কথা।

নূরী বেশ কিছু সময় ঝরণার ধারে বসে থাকে হাঁপিয়ে উঠে, প্রতি মুহূর্তে সে স্বামীর আগমন প্রতীক্ষা করছিলো, কিন্তু সে এলো না।

কিছুক্ষণ পর তাজের পদশব্দ শুনতে পেলো নূরী। ঝরণার পাশ থেকে নিজের ঘরে এসে চুপচাপ শুয়েছিলো বিছানায়। এমন অভিমান তার কোনোদিন হয়নি, আজ কেন যেন সে বড় অভিমানিনী হয়ে উঠে।

কিন্তু একি, আবার তাজের খুরের শব্দ!

নূরী ছুটে যায় জানালার ধারে, দেখতে পায় বনহুর তাজের পিঠে দ্রুত চলে যাচ্ছে। বিস্ময়ের উপর বিস্ময় জাগে, কতদিন পর এলো অথচ সে তার সঙ্গে একটিবার দেখাও করলোনা বা আস্তানার বিশ্রাম কক্ষে এলোনা। কিছুতেই নূরী নিজকে স্থির রাখতে পারে না, দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে।

এমন সময় জাভেদ ছুটে আসে—আম্মু, আম্মু, আব্বু চলে গেছে। আমাকেও সে একটিবার কোলে নেয়নি, আদর করেনি।

নূরী আঁচলে চোখ মুছে বলে—নিষ্ঠুর তোর আব্বু।

কিন্তু আম্মু, আব্বুতো কোনোদিন অমন করে চলে যায় না! আজ অমন এসেই চলে গেলো কেন?

জানি না।

কায়েস চাচাকে বলবো আব্বু কেন এলোনা?

না, থাক কাউকে কিছু বলতে হবে না।

এমন সময় নাসরিন প্রবেশ করে সেই কক্ষমধ্যে, বলে—নূরী, সর্দার এসেই চলে গেলো কেনো?

কেমন করে বলবো বল্।

জাঁভেদ বললো—আব্বু দরবারকক্ষে সবাইকে ডেকে কি যেন বললো। আব্বুকে আজ বড় ব্যস্ত মনে হচ্ছিলো।

হয়তো কোনো জরুরি কাজ আছে তাই.........

জরুরি কাজ—জরুরি কাজ—সব সময়ইতো তার জরুরি কাজ নাসরিন। কাজ, কাজ........না, আমার আর ভাল লাগে না নাসরিন। সত্যি, জীবনটা যেন কেমন হাঁপিয়ে উঠেছে।

জাভেদ বলে উঠে—আম্মু তুমি কিছু ভেবো না, আমি বড় হলে আব্বুকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখবো, যেন সে কোথাও যেতে না পারে। সব সময় আব্বু থাকবে তোমার পাশে। আমি বাইরে থেকে এসে দেখবো আব্বু আর তুমি মজা করে হাসছো।

নূরী কোনো কথা বলে না, একরাশ ব্যথা ঝরে পড়ে তার চোখেমুখে।

নাসরিন বলে— বেশ তাই করো, তাহলে তোমার আম্মু খুব খুশি হবে।

জাভেদ বেরিয়ে যায়।

নাসরিনসহ নূরী এসে বসে বিছানায় পা ঝুলিয়ে।

পা দোলাতে দোলাতে বলে নাসরিন—সত্যি, সর্দার দিন দিন যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে। আজকাল কোনো সময় আস্তানায় থাকতেই চায় না। আজ কতদিন পর এলো অথচ তোর সঙ্গে দেখা না করেই চলে গেলো। যত কাজই থাক একবার দেখা করে যাওয়া উচিত ছিলো তোর সঙ্গে।

ধীরে ধীরে নূরীর মুখ প্রসন্ন হয়ে আসে মেঘমুক্ত আকাশের মত, বলে সে— বোন, আমি জানি ও বড় ব্যস্ত! চিরদিন ও ব্যস্ত থাকবে। সব সময় পরের জন্য ওর কাজ, হয়তো এমন কোনো কাজ রয়েছে যার জন্য ও

আমার সঙ্গে দেখা করতে পারলো না। হয়তো বা মনিরা আপার সঙ্গেও ও দেখা করেনি। ওর উপর অভিমান করে আমি থাকতে পারি না।

নূরী, তোমার কি মনে এতটুকু ঈর্ষা জাগে না। নিজের স্বামীকে তুমি অপর এক নারীর হাতে তুলে দিতে পারো......

স্বচ্ছন্দে, তবে অন্য নারী নয়। মনিরাও যে তার বিবাহিতা স্ত্রী হুরের উপর আমার যেমন দাবী আছে, তেমনি দাবী আছে মনিরা আপার। বরং তার দাবী বেশি, কারণ হুর প্রথম নিজেকে সমর্পন করেছে মনিরার কাছে।

নূরী, কোনো মেয়ে আছে যে তোমার মত কথা বলতে পারে। সত্যি নূরী তুমি ধন্য, তোমার ত্যাগের কাহিনী আমি অনেক জানি। স্বামীকে তুমি হাসিমুখে সমর্পন করেছো তোমার........

চুপ করো নাসরিন। মনিরা আমার বোন, আমি তাকে শ্রদ্ধা করি.........

জানো নূরী, মনিরা কিন্তু তোমাকে এখনও জানে না। জানে না তুমি কে? তার স্বামীর তুমি কি হও.........

এ কথা মিথ্যা নয় নাসরিন। হয়তো যেদিন জানবে সেদিন একটা প্রলয়কান্ড বাঁধিয়ে বসবে। অবশ্য এটা তার অপরাধ নয়। যে কোনো নারীই হোক না কেন, পারে না সে তার স্বামীকে অন্য কোনো নারীর হাতে তুলে দিতে।

কিন্তু তুমি পারো।

সে কথা আগেই বলেছি কেন পারি। নাসরিন, আমার হুরকে আমি পেয়েছি এ আমার তপস্যা, আমার সাধনা।

ঠিক সেই মূহূর্তে ব্যস্তসমস্ত হয়ে কায়েস দলবল সহ সে পথে বেরিয়ে যায়।

নূরী এবং নাসরিন তাকিয়ে থাকে ওদের চলে যাওয়া পথের দিকে।

এমন সময় নাসরিনের কন্যা ফুল্লরা ছুটে আসে—আম্মি, ওরা কোথায় যাচ্ছে?

নাসরিন কন্যাকে টেনে নেয় কোলে—আমি কেমন করে বলবো মা। ওরা কোথায় যাচ্ছে, তা ওরাই জানে।

ছোট্ট শিশু ফুল্লরার কথার কেউ সঠিক জবাব দিতে পারে না, কারণ ওরাও জানে না তারা কোথায় যাচ্ছে। তবে একটু উপলব্ধি করতে ওরা সক্ষম হয়েছে, নিশ্চয়ই সর্দার এমন কোনো কাজের ইংগিত করে গেছে যার জন্য তারা এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে রওয়ানা দিলো।

❑

আমার অনুচরদের বন্দী করে রেখে সে পালিয়েছিলো, এর প্রতিশোধ আমি নেবো। চন্দনা, আমি পুনরায় যাবো তার জম্বু আস্তানায়! দস্যু বনহুরকে কৌশলে বন্দী করবো, যতক্ষণ তাকে আমি বন্দী করতে সক্ষম না হয়েছি ততক্ষণ আমি আশ্বস্ত হবো না।

কিন্তু.........

বল্ থামলি কেন?

যদি তুমি কোনো বিপদে পড়ো.........

চন্দনা!

জানি তুমি অতি বুদ্ধিমতী কিন্তু দস্যু বনহুরও কম বুদ্ধিমান নয়। তার চোখ দুটো দেখেছো রাণী কেমন দীপ্ত আর উজ্জ্বল।

ওসব দেখার সময় আমার নেই, ইচ্ছাও নেই। দস্যু বনহুরকে আমি ঘৃণা করি।

এমন সময় রহমত আসে সেখানে। কুর্ণিশ জানিয়ে বলে—রাণীজী, আমাদের একজন অনুচর সন্ধান নিয়ে এসেছে, যে পথে আপনি জম্বুর আস্তানায় প্রবেশ করেছিলেন, সে পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে।

দস্যুরাণী আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালো, বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললো—দস্যু বনহুর তার জম্বু আস্তানার সুড়ঙ্গপথ বন্ধ করে দিয়েছে?

হাঁ রাণীজী।

তবে কি দস্যু বনহুর তোমার ভয়ে জম্বু আস্তানা গুটিয়ে ফেললো? কথাটা বললো চন্দনা।

দস্যুরাণী ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললো—আমিও কম নই। জম্বু আস্তানা গুটিয়ে সে যাবে কোথায়। পৃথিবীর যে কোন স্থানে সে থাক আমি তাকে খুঁজে বের করবোই করবো।

রাণী।

হাঁ চন্দনা, দস্যু বনহুর আমাকে অপমান করেছে।

আর তুমি তাকে অপমান করোনি। রাণী—দস্যু বনহুরকে তুমিই প্রথম বন্দী করেছিলে? বন্দী করাকে যদি অপমান বলো তবে তুমিই.........

চন্দনা!

রাণী শুনেছি দস্যু বনহুর পরম দয়ালু— যেমনটি তুমি। পরের ব্যথায় তুমি যেমন বিচলিত হও, তেমনি বিচলিত হয় দস্যু বনহুর। কাজেই ঝগড়া না করে সন্ধি স্থাপন করো।

সন্ধি! দস্যু বনহুরের সঙ্গে সন্ধি করবো? চন্দনা যে ব্যক্তি আমাকে শুধু বন্দীই করেছিলো না, আমার নিকটে আমারই রক্তে আঁকা ম্যাপখানা সে দাবী করেছে। আমাকে সে চেনে না, আমাকে সে জানে না চন্দনা—আমি তাকে.........

এমন সময় সেখানে উপস্থিত হয় রঘুনাথ। কুর্ণিশ জানিয়ে বলে—রাণীজী

বলো কি সংবাদ?

এই চিঠিখানা।

দস্যুরাণী চিঠিখানা হাতে নিতেই রঘুনাথ একপাশে সরে দঁড়ালো।

চন্দনা বললো—কার চিঠি?

দস্যুরাণী চিঠিখানা খুলে মেলে ধরেছে চোখের সামনে, চিঠিতে লিখা আছে—রাণী, বিশেষ প্রয়োজনে জম্বু যাচ্ছি। যাবার পথে মন্থনা বন্দরে

জাহাজ 'হীরক হার' এ তোমার জন্য প্রতীক্ষা করবো। এসো আজ, কেমন?—মিঃ চৌধুরী

চন্দনা উঁকি দিয়ে দেখে নিলো, তারপর হেসে বললো—হুঁ, তাই বলি কার চিঠি!

দস্যুরাণী রঘুকে বললো—যাও।

রঘু চলে গেলো।

দস্যুরাণী এবার রহমতকে লক্ষ্য করে বললো—আমার উড়ন্ত সসার বের করতে বলো, আমি এক্ষুণি জম্বু রওয়ানা দেবো।

রহমত কুর্ণিশ জানিয়ে বিদায় নিলো।

চন্দনা বললো— সেকি, মিঃ চৌধুরী আজ সন্ধ্যায় মন্থনা বন্দরে তোমার জন্য প্রতীক্ষা করবেন, আর তুমি জম্বু যাচ্ছো?

যেতে হবে।

কিন্তু মিঃ চৌধুরী?

তিনি ফিরে যাবেন.........

রাণী, কতদিন পর মিঃ চৌধুরী তোমায় ডেকেছেন!

সময় হলে যাবো।

ওকে কষ্ট দিয়ে তোমার এত আনন্দ.........

চন্দনা এখন, যা বলছি।

সত্যি তুমি মন্থনা বন্দরে যাবে না?

আমি না গেলাম তুই যা না, ওর সঙ্গে দেখা করে আসবি।

তাতে কি মিঃ চৌধুরীর মন ভরবে?

একটু হাসলো দস্যুরাণী। মিষ্টি মধুর সে হাসি।

চন্দনা বললো—তুমি যাই বলো ছাড়ছি না তোমাকে। সেদিনও তুমি মিঃ চৌধুরীকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে এসেছিলে।

কে তোকে একথা বলেছে চন্দনা?

তুমি মনে করো আমি কিছু জানি না? সব জানি, সব জানি রাণী.........সেদিন কুহেলি পর্বতের গোপন গুহা থেকে তোমাকে মুক্ত

করবার পর বলেছিলেন তিনি অন্ততঃ একটি দিনের জন্য হলেও তোমাকে যেতে বলেছিলেন তাঁর সঙ্গে, কিন্তু.........

চন্দনা তুই.........

তুমি চুপ করো রাণী। আজ তোমাকে জম্বু যেতে দেবো না। মিঃ আহাদ চৌধুরী মন্থনা বন্দরে তোমার প্রতীক্ষা করবেন, আর তুমি যাবে অন্য পথে। রাণী, কথা দাও জম্বু যাবে না। আমি উড়ন্ত সসার বের করতে মানা করে আসি? বলো, কথা দাও?

বেশ, তাই হোক।

❑

মন্থনা দ্বীপের বড় বন্দর মিসি বন্দর।

অগণিত জাহাজ এখানে নোঙ্গর করে আছে। প্রতিদিন এই বন্দর থেকে কত জাহাজ যে সাগরপথে পাড়ি জমায় তার ঠিক নেই।

প্রতিদিন কত জাহাজ এখানে নোঙ্গর করে। হয়তো বা কয়েক ঘন্টার জন্য বা কয়েকদিনের জন্য, কোনো কোনো সময় প্রায় মাসাধিককালও লেগে যায় বন্দর ত্যাগ করতে।

'হীরক হার' নামক জাহাজের একটি কামরায় বসে আছেন মিঃ আহাদ চৌধুরী। শরীরে তাঁর মূল্যবান স্যুট। একটা সোফায় বসে মূল্যবান সিগারেট পান করে চলেছেন তিনি। দৃষ্টি তাঁর সম্মুখের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে, যে সিঁড়িটা বন্দর থেকে উঠে এসেছে জাহাজের দিকে।

লোকজন তেমন বেশি কেউ উঠানামা করছে না, কারণ জাহাজ হীরক হার মন্থনা মিসি বন্দরে কয়েকঘন্টা মাত্র অপেক্ষা করবে।

মিঃ আহাদ চৌধুরী ক্রমেই যেন ব্যস্ত হয়ে উঠছেন। বারবার তিনি ক্যাবিনের দরজার দিকে তাকাচ্ছেন এবং জানালা দিয়ে তাকাচ্ছেন জাহাজে উঠার সিঁড়িপথের দিকে।

সিগারেটটা এ্যাসট্রের মধ্যে গুঁজে রেখে পুনরায় নতুন সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করছেন। উঠে দাঁড়ান তিনি, বারবার হাতঘড়িটা লক্ষ্য করেন। এবার পায়চারী শুরু করলেন মিঃ আহাদ।

এমন সময় একজন বয় এসে টেবিলে চা রেখে সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

মিঃ আহাদের সেদিকে খেয়াল নেই, তিনি গভীর চিন্তায় মগ্ন, আর মাত্র দু'ঘন্টা বাকি আছে জাহাজ মন্থনা ত্যাগ করবে।

রাণীকে এত করে বলা সত্ত্বেও সে এলো না, মিঃ আহাদ মুষড়ে পড়লেন।

বয় ডাকলো—স্যার, আপনার চা ঠান্ডা হয়ে গেলো।

চা, আমিতো চা চাইনি। কে তোমাকে চা আনতে বললো?

কেন চা খাবেন না আপনি?

কে রাণী! তুমি—তুমি এসেছো রাণী? মিঃ আহাদ চৌধুরী বয়বেশী দস্যুরাণীকে ধরে দু'হাতে ঝাঁকুনি দেন।

অদ্ভুত এবং নিখুঁত ছদ্মবেশ দস্যুরাণীর। পাগড়ীটা মাথা থেকে খুলে রেখে বলে রাণী—জানো তো তোমার ক'জন বন্ধু যাচ্ছেন এ জাহাজে, তারা যদি জানতে পারেন তাহলে আমার অবস্থাটা কি হবে একবার ভেবে দেখেছো?

রাণী, জাহাজখানা বন্দরে নোঙ্গর করার পর থেকে তোমার প্রতীক্ষা করছি। তুমি আসবে জানতাম, কিন্তু তোমার বিলম্ব আমাকে বিচলিত করে তুলেছিলো।

চা-টা খেয়ে নাও আহাদ।

না, চা খাবো না। রাণী, তোমাকে পেয়েছি, সত্যি এ যে আমার কত আনন্দ তা বুঝবে না। মিঃ আহাদ দস্যুরাণীকে নিবিড়ভাবে টেনে নেন কাছে।

দস্যুরাণীর দেহে বয়ের পোশাক, বলে দস্যুরাণী—হঠাৎ যদি কেউ এসে পড়ে তখন কি ভাববে লোকে বলতো?

বলবে বয়কে আদর করছে—বড় মহৎ লোক.........এই তো? যাও, তুমি বড় দুষ্ট।

শুধু আমি নই রাণী, নিজের প্রিয়জনকে কাছে পেলে সবাই অমন দুষ্টমি করে। যেমন তুমিও কম দুষ্ট নও রাণী। কেমন সুন্দর দুষ্টমি করে বয়ের বেশে এসেছো, একটিবার আমাকে ধরা দিতে, তাই না?

যাও?

রাণী! মিঃ আহাদ চৌধুরী গভীরভাবে ওকে আকর্ষণ করেন।

দস্যুরাণী মিঃ আহাদের বাহুবন্ধন থেকে নিজকে মুক্ত করে নিয়ে বলে—দেখা করতে এলাম, এর বেশি কিছু নয়।

কিন্তু আমি কতদিন আর তোমার প্রতীক্ষা করবো রাণী?

বলেছি তো সময় এলে.........

না রাণী, বড় হাঁপিয়ে উঠেছি, সব সময় নিজকে কাজের মধ্যে ডুবিয়ে রাখি তবু যেন সময় কাটে না। প্রতি মুহূর্তে তোমার অভাব আমার মনকে চঞ্চল করে তোলে। রাণী, কতদিন চলবে আমার এ প্রতীক্ষা?

যতদিন আমাদের মিলন না হয়।

মানে বিয়ে?

হাঁ।

কিন্তু মন্ত্র পড়িয়ে মিলন এই কি জীবনের সবচেয়ে বড় কিছু আমাদের মনের বিয়ে কিন্তু হয়ে গেছে অনেকদিন। মনে পড়ে রাণী সেই অজানা দ্বীপের কথা—তুমি আর আমি.........

আহাদ, আমরা উভয়কে উভয়ে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসি কিন্তু আমি চাই আমরা উভয়ে উভয়কে পবিত্রতার মাধ্যমে গ্রহণ করবো।

সেদিন কবে আসবে ভাগ্যে কে জানে। রাণী, ভয় হয় যদি আমাদের মিলন না ঘটে.........

দস্যুরাণী মিঃ আহাদ চৌধুরীর মুখে হাতচাপা দেয়, ছিঃ অমন কথা মুখে এনো না। আমার ভরসা আছে আমরা একদিন......... থাক ওসব কথা, একটা জরুরি কথা বলবো তোমাকে।

মিঃ আহাদ সোফায় বসে পড়লেন।

দস্যুরাণী হাতলে বসে মিঃ আহাদের চুলের মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চয় করে চললো।

মিঃ আহাদ বললেন—বলো কি কথা?

দস্যু বনহুর আমার পিছু লেগেছে জানোতো।

জানি এবং কি কারণে সে তোমার পিছু ধাওয়া করছে তাও জানি। রাণী, দস্যু বনহুর সম্বন্ধে তুমি সদা সচেতন থেকেও কিছু করতে পারবে বলে মনে হয় না, কারণ.........

বলো থামলে কেন?

সে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান। যেমন করে হোক তোমার রক্তে আঁকা ম্যাপ সে হস্তগত করবেই।

আহাদ আমিও কখনো রক্তে আঁকা ম্যাপ কিছুতেই দস্যু বনহুরকে নিতে দেবো না। এরজন্য আমি নতুন এক মতলব এঁটেছি।

বলো কি?

রক্তে আঁকা ম্যাপখানা আমি মন্থনায় না রেখে রায়হানে আমার আস্তানায় রাখবো।

কিন্তু দস্যু বনহুরের অসাধ্য কিছু নেই রাণী, তাই এক কাজ তুমি করতে পারো।

বলো কি কাজ?

রক্তে আঁকা ম্যাপখানা তাকে দিয়ে দাও।

দস্যুরাণী যেন আর্তনাদ করে উঠলো—আহাদ!

রাণী, রক্তে আঁকা ম্যাপ নিয়ে সে ঐ ধনরত্ন তুলে আনবে এবং শত সহস্র দুঃস্থ জনগণের মধ্যে বিলিয়ে দেবে.........

দস্যুরাণী ইতিমধ্যে উঠে দাঁড়িয়েছিলো, এবার সে ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে—সে শতসহস্র জনগণের মধ্যে বিলিয়ে দেবে আর আমি দেবো লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি দুঃস্থ মানুষের মধ্যে! আহাদ, তুমি একথা বলতে পারলে?

মিঃ আহাদ একটু হেসে বললেন—তুমি মিছামিছি ক্রুদ্ধ হচ্ছো রাণী। দস্যু বনহুরকে তুমি এখনও ভালভাবে চিনতে পারোনি। সত্যি সে মহৎ.........

আহাদ, তোমার মুখে এ কথা আমি শুনতে চাইনি। আমি তোমার কাছে জানতে চাই রক্তে আঁকা ম্যাপখানা মন্থনা থেকে রায়হান নিয়ে যাবো কিনা?

ঐ মুহূর্তে ক্যাবিনের বাইরে শোনা যায় জুতোর শব্দ।

মিঃ আহাদ দ্রুতহস্তে দস্যুরাণীর মাথার বয়ের পাগড়ীটা পরিয়ে দিয়ে চুলগুলো ঠেলে তুলে দেন পাগড়ীটার ভিতরে।

দস্যুরাণী চায়ের ট্রে তুলে নেয় হাতে।

এমন সময় কক্ষে প্রবেশ করেন রুদ্র সেন এবং মিঃ অজিত গুহ। মিঃ রুদ্র সেন বলেন—মিঃ চৌধুরী, শুনলাম এ জাহাজে নাকি দস্যুরাণীর আগমন ঘটেছে.........মন্থনা পুলিশ প্রধান এসেছেন এবং তিনি তন্ন তন্ন করে সন্ধান চালাচ্ছেন। জানতে পেরে আমরা ছুটে এলাম। মিঃ চৌধুরী, চলুন আমরাও মন্থনা পুলিশ প্রধানকে সাহায্য করি।

মিঃ আহাদ বললেন—এ জাহাজে দস্যুরাণীর আগমন ঘটেছে, একথা কেমন করে জানতে পেরেছেন মন্থনা পুলিশ বাহিনী?

ঠিক জানি না, তবে মন্থনা দ্বীপের পুলিশমহল দস্যুরাণী সম্বন্ধে সদা সচেতন রয়েছেন। আসুন আর বিলম্ব করা ঠিক হবে না। কথাগুলো বলে মিঃ রুদ্র সেন এবং অজিত গুহ ক্যাবিনের দরজার দিকে পা বাড়ালেন।

মিঃ আহাদ একবার তাকালেন বয়বেশী দস্যুরাণীর মুখের দিকে। দৃষ্টির মাধ্যমে বিদায় সম্ভাষণ জানালেন তিনি দস্যুরাণীকে।

চায়ের কাপসহ ট্রে হাতে মিঃ রুদ্র আর মিঃ অজিতের পাশ কেটে বেরিয়ে যায় বয়বেশী দস্যুরাণী।

মিঃ আহাদ মিঃ রুদ্র সেন এবং মিঃ অজিতকে অনুসরণ করেন।

প্রায় বিশ পঁচিশজন পুলিশের লোক জাহাজখানায় ছড়িয়ে পড়েছে। তারা প্রত্যেকেই অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত। মিঃ আহাদ দেখলেন দু'জন পুলিশ জাহাজের অবতরণমুখে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের হাতেও উদ্যত রাইফেল।

মিঃ আহাদ এবং মিঃ রুদ্র সেনও অজিত গুহকে দেখে এগিয়ে এলেন মন্থনা পুলিশ প্রধান মিঃ কিসো। অর্ধবয়সী ভদ্রলোক, দেহটা বড় মজবুত বলিষ্ঠ, চোখে মুখে বিপুল কর্মোৎসাহভাব ফুটে আছে।

শরীরে পুলিশী ড্রেস। তাঁর হাতেও রিভলভার। ভদ্রলোক এবং তার দু'জন সহকারী এগিয়ে আসতেই মিঃ রুদ্র সেন বললেন—প্রখ্যাত ডিটেকটিভ মিঃ আহাদ চৌধুরী ইনি।

মিঃ কিসো হাত বাড়িয়ে হ্যান্ডসেক করলেন।

মিঃ রুদ্র বললেন—আর ইনি মন্থনা পুলিশ প্রধান মিঃ কিসো।

বিনীত কণ্ঠে বললেন মিঃ কিসো—মিঃ চৌধুরী, অনেকদিন থেকে আপনার কর্মজীবনের নানা কাহিনী শুনে এসেছি, আজ আপনাকে দেখে এবং আপনার সাক্ষাৎলাভ করে সুখী হলাম। দেখুন মিঃ চৌধুরী, আমরা জানতে পেরেছি দস্যুরাণী এ জাহাজে আত্নগোপন করে আছে।

দস্যুরাণী! মিঃ আহাদ দুচোখে বিস্ময় টেনে বললেন।

হাঁ মিঃ চৌধুরী, দস্যুরাণী এ জাহাজেই আছে। আমরা সন্ধান পেয়েই এসেছি। মিঃ চৌধুরী, আপনিও এ ব্যাপারে আমাদেরকে সাহায্য করবেন। মিঃ রুদ্র এবং মিঃ অজিত গুহ আমাদের সহায়তা করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

মিঃ আহাদ বললেন—আমিও করবো মিঃ কিসো।

শুনে আনন্দিত হলাম। বললেন মিঃ কিসো।

এবার সবাই ছড়িয়ে পড়লেন জাহাজের বিভিন্ন দিকে। মিঃ কিসো মিঃ আহাদকে সঙ্গে নিলেন, তাঁর দু'জন সঙ্গী মিঃ রুদ্র সেন এবং মিঃ অজিত গুহকেও তিনি সঙ্গে নিতে ভুললেন না।

মিঃ কিসোর ব্যস্ততার অন্ত নেই, দস্যুরাণীকে খুঁজে বের করতেই হবে। আর মাত্র একঘন্টা পর জাহাজ হীরক হার মন্থনা বন্দর ত্যাগ করবে কিন্তু দস্যুরাণীকে অনেক সন্ধান করেও কোথাও পাওয়া গেলো না।

বিরাটকায় জাহাজখানায় প্রায় পাঁচশত যাত্রী, কাউকে বন্দরে নামতে দেওয়া হচ্ছে না বা উঠতে দেওয়া হচ্ছে না।

ঘন্টাখানেক অবিরাম সন্ধান চালিয়ে হাঁপিয়ে উঠলেন কিসো এবং তাঁর সহকারীরা।

মিঃ আহাদ মিঃ কিসোর বিশাল বপুবিশিষ্ট ঘর্মাক্ত দেহের দিকে তাকিয়ে দেখে মৃদু হেসে বললেন—এখনও জাহাজ ছাড়তে একঘন্টা বাকি, আপনাকে বড় ক্লান্ত মনে হচ্ছে। আসুন কিছুটা জিরিয়ে নেওয়া যাক।

মিঃ কিসোর মনটাও তাই চাইছিলো। তিনি আজ প্রায় বিশ বছর হলো পুলিশের চাকরিতে আছেন। জীবনে বহু দস্যুকে তিনি গ্রেপ্তার করেছেন, কত খুনীকে তিনি পাকড়াও করেছেন। অথচ দস্যুরাণীকে খুঁজতে এসে তিনি হিমসিম খেয়ে গেছেন যেন। আংগুল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে ফেলে বললেন—চলুন, তাই চলুন।

অদূরে একটি খালাসীকে দেখে বললেন মিঃ আহাদ—চার কাপ চা পাঠিয়ে দাও।

আসুন মিঃ কিসো, আসুন মিঃ রুদ্র, মিঃ গুহ ক্যাবিনে গিয়ে বসা যাক।

তাঁরা ক'জন মিলে এসে বসলেন মিঃ আহাদের ক্যাবিনে।

মাঝখানে গোলাকার টেবিল।

টেবিলের চারপাশে কয়েকখানা চেয়ার। মিঃ আহাদ সকলের সম্মুখে তাঁর রৌপ্যের তৈরি সিগারেট কেসটা বের করে রাখলেন, বললেন—দয়া করে গ্রহণ করুন।

মিঃ রুদ্র সেন এবং মিঃ অজিত গুহ সিগারেট কেস্ থেকে এক-একটা সিগারেট তুলে নিলেন।

মিঃ কিসোর ললাটে চিন্তার ছাপ ফুটে উঠেছে। তিনি অন্য-মনস্কভাবে ভাবছিলেন কিছু। দস্যুরাণীকে নিয়েই তিনি ভাবনা করে চলেছেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

মিঃ আহাদ বললেন—নিন, মিঃ কিসো, একটি সিগারেট নিন।

মিঃ কিসোর যেন হুশ হলো, তিনি একটি সিগারেট তুলে নিলেন মিঃ আহাদের সিগারেট কেস থেকে।

মিঃ আহাদ নিজ হাতে তাঁর সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করলেন।

এমন সময় বয় এসে টেবিলে চার কাপ চা সহ ট্রে নামিয়ে রাখলো।

মিঃ আহাদ ট্রে থেকে চায়ের কাপগুলো নামিয়ে নিয়ে এক এক জনের হাতে দিলেন।

মিঃ কিসো চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন—আমি যেমন করে হোক দস্যুরাণীকে গ্রেপ্তার করবোই মিঃ চৌধুরী। আপনারা শুধু আর কিছুক্ষণ আমাকে সহায়তা করবেন।

নিশ্চয়ই করবো মিঃ কিসো। বললেন মিঃ আহাদ।

মিঃ রুদ্র বললেন—প্রায় ঘন্টাখানেক হলো সমস্ত জাহাজখানা চষে ফেললাম আমরা অথচ দস্যুরাণীকে পাওয়া গেলো না।

বয় ততক্ষণে টেবিলে চা দিয়ে বেরিয়ে গেলো।

মিঃ গুহ বললেন—দস্যুরাণী কেমন দেখতে, যদি না চিনে থাকেন তবে কি করে তাকে খুঁজে বের করবেন আপনারা, মিঃ কিসো?

ঠিক বলেছে মিঃ গুহ, তবে যেভাবে দস্যুরাণী সম্বন্ধে আমাদের কাছে বর্ণনা আছে তাতে তাকে খুঁজে পাওয়া বেশি কঠিন হবে না।

সত্যি বলেছেন, দস্যুরাণীকে বের করতে মোটেই বিলম্ব বা কষ্টকর হবে না, যদি তার ঠিক ঠিক চেহারার বর্ণনা থাকে। বললেন মিঃ আহাদ।

মিঃ কিসো বুক পকেট থেকে একটি কাগজ বের করে মেলে পড়ে শুনালেন—পাতলা গড়ন, মাথায় ঝাঁকড়া রেশমী চুল গভীর কালো চোখ, দুধে আল্‌তা দেহের বর্ণ, সরু দুটি ঠোঁট।

বাস্ থাক থাক আর পড়তে হবে না, এবার দস্যুরাণী যাবে কোথায়! বললেন মিঃ গুহ।

মিঃ রুদ্র বললেন—দস্যুরাণী কি ধরনের পোশাক পরে এর কোনো বর্ণনা নেই কি?

আছে আছে শুনুন মিঃ রুদ্র আমি আবার পড়ছি।

দেখুন পূর্বে যেটুকু বর্ণনা দিয়েছেন বা পড়েছেন ওটা না পড়ে নিচে পড়ুন।

হাঁ তাই পড়ছি। দস্যুরাণীর দেহে প্রায়ই কালো পোশাক থাকে। তবে সে বেশি সময় শিকারীর পোশাক পরতে ভালবাসে। প্যান্ট পরতে সে বেশি ভালবাসে বলে মনে হয়। কারণ তাকে সব সময় প্যান্ট পরিহিতা অবস্থায় লক্ষ্য করা গেছে। হাঁ, এই ধরনের মেয়ে একটিও নজরে পড়লো না আমার। কথাগুলো বললেন মিঃ কিসো। তারপর উঠে পড়লেন।

এমন সময় বয় এসে ট্রের উপরে চায়ের কাপগুলো সাজিয়ে বিলসহ একটি ছোট্ট প্লেট রাখলো মিঃ আহাদের সম্মুখে।

মিঃ আহাদ বিলকরা কাগজের টুকরাটা তুলে নিয়ে কয়েকটা টাকা প্লেটে রাখলেন। বয় প্লেটটা তুলে নিয়ে ছালাম জানিয়ে বেরিয়ে গেলো।

মিঃ আহাদ সকলের অলক্ষ্যে বিলটা পকেটে রাখলেন।

মিঃ কিসো বললেন—চলুন জাহাজ ছাড়ার আর বেশি বিলম্ব নেই, এ সময়ের মধ্যেই আমাদের জাহাজ তল্লাশি সমাধা করতে হবে।

পুনরায় শুরু হলো জাহাজে দস্যুরাণীর সন্ধানে ভীষণ একটা তোলপাড়।

মহিলা মহলে প্রত্যেকটা মহিলাকে ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখা হলো কিন্তু দস্যুরাণীর সন্ধান মিললো না।

মিঃ কিসো যখন বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন, হতাশ হয়ে পড়েছেন ঠিক ঐ মুহূর্তে পুলিশ অফিসার মিঃ সিকাগো একটি তরুণীকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে এলেন মিঃ কিসো ও তাঁর সঙ্গীদের সম্মুখে।

তরুণী যতই বলছেন, আমি দস্যুরাণী নই, ততই মিঃ সিকাগো তাকে এঁটে বাঁধার জন্য নির্দেশ দিচ্ছে। তিনি তরুণীকে নিয়ে হাজির হয়ে মিঃ

কিসোকে বললেন—স্যার, দস্যুরাণীর বর্ণনাসহ কাগজখানা বের করুন তো। এই তরুণী দস্যুরাণী না হয়েই যায় না। এই দেখুন ওর দেহে আঁটসাট প্যান্টসার্ট এবং টাই। চুল রেশমের মত লালচে এবং চোখ দুটো কালো এবং সুন্দর। দেহের গড়ন ছিপ্‌ছিপে......স্যার সব মিলে গেছে, এটাই দস্যুরাণী।

মিঃ আহাদ মৃদু হাসলেন, তিনি কোনো কথা বললেন না।

কিন্তু রুদ্র সেন মিঃ অজিত গুহ এবং মিঃ কিসো ও অন্যান্য; পুলিশ অফিসার বিস্ময় নিয়ে সবাই দেখছেন, দস্যুরাণীকে তাঁরা চোখের সম্মুখে দেখতে পাচ্ছেন এ যেন অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

মিঃ কিসো দস্যুরাণীকে বেঁধে ফেলার নির্দেশ দিলেন।

ততক্ষণে জাহাজ ছাড়ার সময় হয়ে গেছে। জাহাজে উঠা এবং নামার সিঁড়ির মুখ খুলে দেওয়া হলো।

জাহাজে যারা মন্থনা বন্দরের লোক উঠেছিলেন তারা নেমে গেলেন। যারা নিচে ছিলেন উঠে এলেন, দস্যুরাণীকে মন্থনা পুলিশমহল গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেলেন।

একটু পরেই জাহাজ মিসি বন্দর ত্যাগ করলো।

মিঃ আহাদ, মিঃ রুদ্র সেন এবং মিঃ অজিত গুহ দাঁড়িয়ে আছেন ডেকে।

ক্রমে বন্দরখানা ধীরে ধীরে দৃষ্টির সম্মুখে ঝাপসা হয়ে এলো, এক সময় মিশে গেলো দৃষ্টির অন্তরালে।

মিঃ আহাদ সিগারেট ধরালেন।

তিনজন প্রখ্যাত গোয়েন্দা চলেছেন ম্যানিলা অভিমুখে। ম্যানিলার একটি গবেষণাগার থেকে প্রায় শত কোটি টাকা মূল্যের স্বর্ণগোলক উধাও হয়েছে। কে বা কারা এই স্বর্ণগোলক সরিয়েছে কেউ তার সন্ধান করতে পারেনি। ম্যানিলা পুলিশবাহিনী এবং গোয়েন্দা বিভাগও পরাজিত হয়েছেন। এ কারণে মিঃ আহাদ চৌধুরী এবং তার সঙ্গে মিঃ রুদ্র ও মিঃ অজিত গুহকে ম্যানিলা সরকার আহ্বান জানিয়েছেন।

ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার জমাট বেঁধে উঠে। মিঃ আহাদ মিঃ রুদ্র সেন ও মিঃ গুহের অলক্ষ্যে ফিরে আসেন ক্যাবিনে।

সোফায় দেহটা এলিয়ে দিয়ে পকেট থেকে বের করেন বয়ের দেওয়া চায়ের বিল করা কাগজের টুকরাটা। একপাশে চায়ের মূল্য তালিকা অপর পাশে কয়েকটি অক্ষর—প্রিয়তম, সত্যি তোমাকে ছেড়ে

যেতে বড় কষ্ট হচ্ছে কিন্তু না
গিয়ে উপায় নেই। মন্থনায়
আমার অনেক কাজ আছে।
ম্যানিলা থেকে তুমি জয়ী হয়ে
ফিরে এসো? তোমার প্রতীক্ষা
করবো। বিদায় বন্ধু।

তোমার—
'রাণী'

একবার নয় দু'বার নয় বেশ কয়েকবার তিনি পড়লেন চিরকুটখানা।

তারপর সিগারেটের পর সিগারেট নিঃশেষ করে চললেন। একরাশ ধোঁয়ার মধ্যে তাঁর চোখের সম্মুখে ভাসতে লাগলো দস্যুরাণীর মুখখানা।

❑

এত হাসছো কেন বলো রাণী?

তুই বুঝবি না চন্দনা, তুই বুঝবি না।

ব্যাপার কি খুলেই বলোনা শুনি? উড়ন্ত সসারে তুমি গেলে রায়হানে কিন্তু হঠাৎ চলে গেলে মিসি বন্দরে। তারপর ফিরে এলে বয়ের বেশে। সমস্ত মুখে তোমার আনন্দের উচ্ছ্বাস.........

দস্যুরাণী হাতের রিভলভারখানা দোলাতে দোলাতে বললো—দস্যুরাণী গ্রেপ্তার হয়েছে।

এ্যাঁ বলো কি রাণী?

হাঁ মন্থনা পুলিশবাহিনী তাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে এসেছে মন্থনা জেলে।

সত্যি?

তবে যে তুমি শশরীরে.........

এ আমার নশ্বর দেহ।

রাণী, ঠাট্টা রাখো বলছি। সত্য করে বলো কি হয়েছে?

এবার দস্যুরাণী শয্যায় দেহটা এলিয়ে দিয়ে বলে—চন্দনা, একটা নিরাপরাধ তরুণীকে মন্থনা পুলিশ প্রধান মিঃ কিসো ও তাঁর দল বল পাকড়াও করে নিয়ে গেছে।

তারপর?

নির্বোধ পুলিশ অফিসারগুলো মনে করেছে সে-ই দস্যুরাণী, কাজেই তার কোনো কথা কেউ শুনলো না।

মিঃ চৌধুরী তিনিও কিছু বললেন না?

পাগলী মেয়ে তুই চন্দনা। মিঃ চৌধুরী কি বলবেন? তিনি কি কোনোদিন দস্যুরাণীকে চোখে দেখেছেন যে চিনবেন। মন্থনা পুলিশবাহিনী মিঃ চৌধুরী এবং তাঁর দু'জন সঙ্গীকেও সঙ্গে নিয়ে জাহাজ 'হীরক হার-এ' তল্লাশি চালিয়েছিলো এবং তাঁরা দস্যুরাণীকে আবিষ্কার করে গ্রেপ্তার করেছে।

না জানি কোন্ বেচারী.........

বেচারী তো বটেই।

একটা নিরীহ তরুণীকে ওরা বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে আর তুমি চুপ রইলে?

চন্দনা, কি করবার ছিলো তখন আমার বল্‌তো? যদিও আমি ঐ মুহূর্তে মনে মনে বেশ একটা তামাশা অনুভব করছিলাম কিন্তু সত্যি বলতে কি বড্ড খারাপ লাগছিলো, বারবার মনে হচ্ছিলো নিজের হাত দু'খানা বাড়িয়ে দেই। জানিস চন্দনা, পুলিশমহল এমনি ভুল সব সময় করে আসছেন। হয়তো দোষী ব্যক্তি স্বচ্ছন্দে চোখের সম্মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর নিরপরাধী ব্যক্তি পাকড়াও হচ্ছে। শুধু তই নয়, বিচারেও হয়তো উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে নির্দোষ ব্যক্তির জেল বা ফাঁসী হয়ে যাচ্ছে.........একটু থেমে বলে দস্যুরাণী—এই পৃথিবীর বুকে এমনি কত মিথ্যা সত্য হচ্ছে আর সত্য মিথ্যায় পরিণত হচ্ছে। যেমন আমি অপরাধী হয়েও স্বচ্ছন্দে সবার চোখে

ধুলো দিয়ে নির্বিঘ্নে সরে এলাম, আর বেচারী তরুণী বন্দী হলো নির্দোষী হয়েও। জানিস্ চন্দনা, আজকাল আরও একটি নতুন ঘটনা ঘটছে অহঃরহ।

কি ঘটনা রাণী?

আজকাল কিছুসংখ্যক লোক, বেশিরভাগ যুবক-সমাজ আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে এখানে-সেখানে হানা দিয়ে অন্যায়ভাবে অর্থ সংগ্রহের নেশায় মেতে উঠেছে। দেশের জনগণের কোনো নিরাপত্তা নেই। সবাই এদের জন্য সদা উদ্বিগ্ন। এরা মাঝে মাঝেই হামলা চালিয়ে লুটতরাজ করে। শোন্ চন্দনা—একটা গল্প বলছি।

বলো—

সেদিন কোনো এক ভদ্রলোকের ছেলে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলো—ছেলেটি মহৎ এবং শিক্ষিত। সে যখন গাড়ি নিয়ে একটি গলির মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিলো, তখন হঠাৎ কোনো ব্যক্তি চিৎকার করে বলে উঠে—হাইজ্যাকার পালিয়ে যাচ্ছে, ধরো— মারো.........আর যাবে কোথায়, চারদিক থেকে জনগণ ছুটে এলো তারপর ছেলেটিকে ইটপাটকেল এবং লাঠি দিয়ে বেদম প্রহার করে চললো। ছেলেটি কিছু বুঝতেই পারলো না, কেন তাকে এভাবে মারা হচ্ছে। সে যতই চিৎকার করে বোঝাতে চাইছে আমি কোনো দোষ করিনি, আমি অপরাধী নই কিন্তু কেউ তার সে ব্যাকুল আর্তনাদে কান দিলো না। জনগণ তখন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে, হত্যার নেশায় তারা উন্মাদ। একবার ভেবে দেখলো না, ছেলেটি সত্যি অপরাধী কিংবা হাইজ্যাকার কিনা। একটি নিষ্পাপ জীবন প্রদীপ নিভে গেলো, পথের বুকে পড়ে রইলো একটি রক্তাক্ত দেহ।

উঃ! কি ভয়ঙ্কর কথা রাণী!

শুধু ভয়ঙ্কর নয় চন্দনা, হৃদয়হীনতার এক মর্মস্পর্শী কাহিনী। সত্যিকারের অপরাধী শাস্তি পাক দুঃখ নেই কিন্তু নির্দোষ ব্যক্তি যদি এভাবে প্রাণ হারায়, এর মত আফসোস আর কিছু নেই। চন্দনা, আজকাল প্রায়ই এ ধরনের ঘটনা দেশের বিভিন্ন স্থানে ঘটে চলেছে। দেশের জনগণকে তাই সাবধান হওয়া উচিত, তাদের উচিত কারও কথায় কান না দিয়ে অপরাধী

নামক ব্যক্তিকে ধরা এবং সত্যিই দোষী কিনা ভালভাবে জেনে নেওয়া, তারপর শাস্তি দেওয়া।

কেন পুলিশের হাতে তুলে দেওয়াও তো যায়? পুলিশ নিশ্চয়ই আটক রেখে সব কিছু সন্ধান নিয়ে তার বিচার করবে?

চন্দনা, এখন সে যুগ নেই। হয়তো একটি সত্যিকারের দুস্কৃতিকারী ধরা পড়লো এবং তাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করলো। হাজতে বা জেলে আটক করা হলো কিন্তু সেই দুস্কৃতিকারী এমন কোনো ব্যক্তি কিংবা এমন কোনো স্বনামধন্য ব্যক্তির আদুরে দুলাল যাকে আটক করার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ মহলে সাড়া পড়ে গেলো। চারদিক থেকে ফোন আসতে লাগলো। তখন পুলিশ মহলের নতি স্বীকার করা ছাড়া কোনো উপায় থাকে না। ন্যায়নীতি বিসর্জন দিয়ে সেই দুস্কৃতিকারীকে মুক্তি দিতে বাধ্য হলো।

এটা কি আইন-শৃঙ্খলার কথা?

এ ক্ষেত্রে আইন শৃঙ্খলা চলে না। দেশে এক ধরনের লোক আছেন যাদের হাতের মুঠায় আইন-শৃঙ্খলা আবদ্ধ, তারাই পুলিশ মহলকে যেভাবে ইংগিত করছেন পুলিশমহল সেইভাবেই কাজ করছে। চন্দনা, তুই হয়তো শুনে থাকবি এক সময় দেশে পুতুল নাচের রেওয়াজ ছিলো। পর্দার আড়ালে থাকতো পুতুল নাচাবে যারা আর পর্দার বাইরে থাকতো পুতুলগুলো। প্রত্যেকটা পুতুলের গলায় থাকতো সূতোবাঁধা। আড়াল থেকে পুতুল নাচানেওয়ালা সূতো ধরে টানতো তখন পুতুলগুলো ঠিক তাদের হাতের কারসাজিতে নাচতো। দর্শকমহল দেখতেন এবং আনন্দ উপভোগ করতেন। আজকাল পুলিশমহল তেমনি একদল স্বনামধন্য ব্যক্তির হাতে নাচের পুতুল হয়ে গেছে এবং সে কারণেই আসল দোষী মুক্তি পাচ্ছে, আর নির্দোষ ব্যক্তির শাস্তি হচ্ছে। জনগণ তাই বিশ্বাস পায় না, দৃস্কৃতিকারীকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েও তাই তারা নিশ্চিন্ত নয়, কারণ বিচার ঠিকমত হবে না এই তারা জানে।

চন্দনা বলে উঠলো—জনগণের কি উচিত তাদের হত্যা করা?

হত্যা করা মোটেই উচিত নয়। দোষী যারা তাদেরকে হত্যা করলে তারা তো পরিত্রাণ পেয়ে গেলো।

তবে কি করে উচিত সাজা দেওয়া যায় যারা দোষী তাদেরকে?

হাত বা কান কেটে দেওয়া বা চিরদিনের জন্য অন্ধ করে দেওয়া যাতে তারা এ সুন্দর পৃথিবীতে জীবন্মৃত হয়ে থাকে। নিজ নিজ কর্মফলের জন্য চিরদিন অভিশপ্ত জীবনের বোঝা টেনে নিয়ে বেড়াতে বাধ্য হয় কিন্তু সাবধান হতে হবে, নির্দোষী যেন শাস্তি না পায়।

সত্যি রাণী! তুমি অদ্ভুত মেয়ে।

যাক ওসব কথা এখন শোন্ চন্দনা, ওকে কি করে উদ্ধার করা যায়?

কার কথা বললো রাণী?

আমার পরিবর্ত্তে যাকে মন্থনা পুলিশবাহিনী ফলাও করে ধরে নিয়ে গেছে।

ও সেই নির্দোষ তরুণীর কথা বলছো?

হাঁ চন্দনা, ওকে না উদ্ধার করা পর্যন্ত আমি নিশ্চিন্ত নই। বেচারী........একটু থেমে বললো দস্যুরাণী—চন্দনা, আমাকে আজ রাতেই রায়হান অভিমুখে রওয়ানা দিতে হবে, তার পূর্বেই আমি.........কথা শেষ না করেই দস্যুরাণী টেবিল থেকে একটা কাগজ আর কলম তুলে নিলো, তারপর কিছু লিখলো সে। লিখা শেষ করে কাগজের টুকরাটা চন্দনার হাতে দিয়ে বললো—পড়!

চন্দনা দু'চোখ বিস্ফারিত করে চিঠিখানা পড়তে শুরু করলো—

> "পুলিশ প্রধান, যাকে আপনারা জাহাজ
> 'হীরক হার' থেকে দস্যুরাণী মনে করে
> এনেছেন, আসলে সে দস্যুরাণী নয়—
> ওর নাম লুসি........
>
> —দস্যুরাণী।

পড়া শেষ করে চন্দনা তাকালো দস্যুরাণীর মুখের দিকে, বললো—কে সেই তরুণী লুসি? আর তাকে তুমিই বা চিনলে কি করে?

চন্দনা, 'হীরক হার-এ' যখন কয়েক ঘন্টা ছিলাম, তখন কোনো সংবাদ জানা আমার বাকি নেই। কার নাম কি সব আমি জেনে নিয়েছিলাম কিছুক্ষণের মধ্যেই। মেয়েটির নাম লুসি, সে তার কাকার সঙ্গে ম্যানিলা যাচ্ছিলো।

কাকার সঙ্গে? কিন্তু তাকে যখন দস্যুরাণী মনে করে পুলিশবাহিনী ধরলো তখন তার কাকা কোথায় ছিলেন?

কাকা, সে এক নির্বোধ ব্যক্তি। ভাইঝিকে পুলিশবাহিনী গ্রেপ্তার করার সঙ্গে সঙ্গে উধাও। কারণ সে মনে করেছে ভাইঝির সঙ্গে নিজকে জড়াতে গিয়ে শেষ নিজেও না গ্রেপ্তার হয়ে পড়ে, তাই সকলের অলক্ষ্যে সে সরে পড়েছিলো 'হীরক হার' থেকে।

তারপর লুসি যখন নানাভাবে বোঝাতে চেষ্টা করছিলো, আমি দস্যুবাণী নই, তখন সে অসহায়ভাবে তাকাচ্ছিলো কাকার সন্ধানে কিন্তু কাকা তখন নিখোঁজ। লুসি বুদ্ধিমানের মতই কাজ করেছে, সে কাকাকে আশেপাশে না দেখে কাকার নামটাও আর মুখে আনেনি। শোন্ চন্দনা, এই চিঠিখানা পুলিশ প্রধান মিঃ কিসোর টেবিলে পৌঁছে দিবি। আমি যেন লুসিকে মুক্ত দেখতে পাই।

রাণী, তুমি চলে গেলে আমার মোটেই ভাল লাগে না।

তা আমি জানি। চন্দনা, রক্তে আঁকা ম্যাপখানা আমাকে রক্ষা করতেই হবে, এটা আমার পালিত বাবার নিদর্শন।

দস্যুরাণী ড্রেস পরিবর্তন করতে ড্রেসিংরুমে প্রবেশ করে।

চন্দনা বসে বসে নিজের চুলে বিনুনী করে নেয়।

ফিরে আসে দস্যুরাণী, তার শরীরে এখন দস্যুরাণীর ড্রেস। কোমরের বেল্টে রিভলভারটাকে ঠিকমত সোজা করে রাখতে রাখতে বলে দস্যুরাণী—চন্দনা, লুসি মুক্তি না পাওয়া পর্যন্ত আমি স্বস্তি পাবো না, কাজেই.........

এত বলতে হবে না, সব ব্যবস্থা আমি করবো। দরকার হলে মিঃ কিসোকে নাকে দড়ি লাগিয়ে এনে হাজির করবো তোমার দরবারে। এবার বলোতো রাণী, তোমার মিঃ চৌধুরীর কিছু সংবাদ?

কি শুনতে চাস্ তুই?

মানে কেমন আলাপ-সালাপ হলো? কতক্ষণ ছিলে তাঁর পাশে? কি কি কথা হলো তোমাদের দু জনার মধ্যে.........

ভারী দুষ্ট হয়েছিস তুই চন্দনা।

কি এমন দুষ্টমি করলাম বলতো? সত্যি রাণী, কতদিন যে তোমার মিঃ চৌধুরীকে দেখিনি.........

মিঃ চৌধুরী না মিঃ সমির কুমারকে দেখিস্নি?

যাও রাণী তুমি বড্ড ইয়ে।

কেন, সমির বাবুকে তোর দেখতে ইচ্ছে হয় না বুঝি? জানি কিন্তু সমীর বাবু নাকি রায়হানে কোনো এক কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছেন।

মিঃ আহাদ চৌধুরীর সহকারী মিঃ সমির কুমার বাবু। মিঃ আহাদের সঙ্গে যখন দস্যুরাণীর প্রথম দেখা হয় তখন সমির বাবুর সঙ্গে চন্দনার পরিচয় ঘটেছিলো। যদিও সেদিন সমির বাবুকে চন্দনা উপেক্ষাই করেছিলো, কেমন যেন গোলগাল ফুটবলের মত মানুষটিকে ওর পছন্দ হয়নি কিন্তু পরপর সমির কুমার বাবুর সঙ্গে ওর সান্নিধ্য গড়ে উঠেছিলো। সদা হাস্যোদ্দীপ্ত মানুষটাকে শেষে ভাল না বেসে পারেনি চন্দনা।

তারপর বহুবার সমির বাবুর সঙ্গে দেখা চন্দনার। উভয়ের মধ্যে একটা নিবিড় সম্বন্ধও গড়ে উঠেছে, জানে দস্যুরাণী। অবশ্য এ ব্যাপারে দস্যুরাণী এবং আহাদ চৌধুরী আনন্দ উপভোগ করে থাকে।

তাই দস্যুরাণীকে চন্দনা যখন মিঃ চৌধুরী সম্বন্ধে কিছু বলে ঠাট্টা করে তখন দস্যুরাণীও মজা করে বলে কিছু কিছু। চন্দনাও হাসে, সমির বাবুকে নিয়ে রাণীর মুখে কথাগুলো বেশ ভাল লাগে ওর।

দস্যুরাণী বলে আবার—চন্দনা, মন্থনায় বেশিদিন হয়তো থাকা চলবে না, কারণ রায়হানে আমার অনেক কাজ আছে।

কিন্তু.........

বলো?

রাণী, তুমি মন্থনা থেকে চলে গেলে অসুবিধা হবে না এখানে?

হবে জানি, কিন্তু না গিয়ে উপায় নেই।

মিঃ চৌধুরী ম্যানিলা থেকে ঝাম শহরেই ফিরে আসবেন শুনেছি।

হাঁ।

তাহলে তুমি মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে.........

আপাততঃ তার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই।

রাণী!

হাঁ চন্দনা, আমি জানি তিনি আমাকে পাবার জন্য.........

দস্যুরাণীর মুখের কথা কেড়ে নেয় চন্দনা—তিনি তোমাকে পাবার জন্য ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন, এই তো?

যদি মনে করিস্ তবে তাই।

আর তুমি?

মিথ্যে নয়, আমিও তাঁকে পেতে চাই কিন্তু.........

বলো রাণী কিন্তু কি?

কিন্তু বাধা আছে অনেক।

বাধা! কিসের বাধা রাণী?

বুঝবি না চন্দনা......... সে অনেক কথার মালা যা সমস্ত রাত জেগে বললেও ফুরোবে না।

দস্যুরাণীর কথায় চন্দনার মুখমন্ডলে একটা জানার বাসনা ফুটে উঠে, দীপ্তময় দুটি চোখে তাকায় চন্দনা—একটু বলবে না রাণী?

এতই যদি জানার লোভ হয়ে থাকে তবে না বলে আমিও যে স্বস্তি পাবো না। পৃথিবীর মানুষ সবাইতো ভালবাসে সবাইকে অদম্য এক বাসনা নিয়ে। কেউ স্নেহের কাঙ্গাল, কেউ বা সান্নিধ্যের আবার কেউ কেউ প্রেম-প্রীতির কাঙ্গাল.........

তুমি! তুমি কিসের কাঙ্গাল রাণী?

আমি মানুষ, তাই এ সবের প্রত্যেকটার জন্যই আমার লোভ আছে, কিন্তু চাইলেই তো আর পাওয়া যায় না। তাই যা চাই তা পাই না, আর পেলেও তা গ্রহণ করতে পারি না।

রাণী, তোমার কথাগুলো বড় হেঁয়ালিপূর্ণ।

হাসলো দস্যুরাণী, বললো সে— হেঁয়ালিতেই ভরা আমার জীবন। হেঁয়ালি ছাড়া কিইবা পাবি আমার কাছে। জানি তুই জানতে চাস মিঃ চৌধুরীকে আমি কেন দূরে সরিয়ে রাখি?

হাঁ রাণী, অনেকদিন হলো তুমি তাকে চুম্বকের মত আকর্ষণ করছো কিন্তু ধরা দিচ্ছো না। বলোতো এ তোমার কেমন ধারা?

ওটাইতো চুম্বকের স্বার্থকতা—নিজে আকর্ষিত না হয়ে অপরকে আকর্ষণ করা। শোন্ আসল কথা হলো যা তুই ভাবছিস্ তার সময় আসেনি। চন্দনা, তুই কি জানিস্ না ভাই আমার কত কাজ?

জানি সব জানি রাণী কিন্তু.........এমনি করে কতদিন একা একা নিঃসঙ্গ জীবন অতিবাহিত করবে?

নিঃসঙ্গ জীবন এ তুই কি বলছিস্? তুই আমার পাশে আছিস্, পাশে আছে আমার অগণিত অনুচর। এ ছাড়া আমার চারপাশে ঘিরে আছে রায়হানের অসংখ্য দুঃস্থ জনগণ। চন্দনা?

বলো?

আমি রায়হানে যাচ্ছি, এদিকে সবকিছু খেয়াল রাখবি। রাত এখন তিনটা বাজে.........হাতঘড়ি দেখে কথাটা বলে দস্যুরাণী।

চন্দনা বলে, চলো তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।

চল্ চন্দনা।

দস্যুরাণী এবং চন্দনা বেরিয়ে আসে মন্থনা আস্তানার বাইরে।

অদূরে একটি নীলাভ উজ্জ্বল আলোকরশ্মি ছড়িয়ে আছে। উড়ন্ত সসার অপেক্ষা করছে দস্যুরাণীর জন্য।

দস্যুরাণী তার উড়ন্ত যানে এসে বসে, সঙ্গে সঙ্গে যানটি আকাশে উড়ে উঠে এবং মুহূর্তে দৃষ্টির অন্তরালে চলে যায়।

মাঝে মাঝে মন্থনার আকাশে একটি নীলাভ আলোকরশ্মি নিয়ে অনেকে অনেক রকম কথার ফুলঝুরি সৃষ্টি করছে বেশ কিছুদিন যাবৎ। কিন্তু কেউ সঠিকভাবে বলতে পারে না সেটা কি এবং কিসের সেই নীলাভ

আলোরছটা। জনগণ হঠাৎ গভীর রাতে কোনো কোনোদিন দেখে থাকে এ আলোকরশ্মি।

শুধু জনগণ নয়, অনেক গবেষকও নানাভাবে গবেষণা শুরু করে দিয়েছেন এ আলোকরশ্মিটির উদঘাটনে, কিন্তু কেউ আজও সফলকাম হননি।

কথাটা পুলিশমহলেও বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। পুলিশমহলও লক্ষ্য করেছে এ আলোকরশ্মি, মাঝে মাঝে আকাশের একপ্রান্ত থেকে আরেকপ্রান্তে চলে যায়। কোথায় যায়, কেন যায়, কিসের আলো তার তারাও জানে না।

❑

দস্যুরাণী গ্রেপ্তার হয়েছে এ নিয়ে সমস্ত শহরে সাড়া পড়ে গেলো। সবার মুখে মুখে এবং নানা পত্র-পত্রিকায় দস্যুরাণী গ্রেপ্তারের সংবাদ প্রচারিত হলো।

মন্থনা পুলিশ অফিসে দস্যুরাণী গ্রেপ্তার নিয়ে তুমুল আলোচনা চলছিলো।

বন্দীখানার সম্মুখে সাংবাদিক এবং ফটোগ্রাফারের অসংখ্য ভিড় হয়েছে। মন্থনার বহু লোক এসেছে দস্যুরাণীকে স্বচক্ষে দেখতে।

মিঃ কিসো এলেই দস্যুরাণীকে বন্দীখানা থেকে বের করে বিচার কক্ষে নেওয়া হবে।

সবাই বিপুল উম্মাদনা নিয়ে প্রতীক্ষা করছে কখন আসবেন মিঃ কিসো।

জনগণকে শান্ত এবং শৃঙ্খলামত সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য পুলিশগণ ব্যস্তভাবে কাজ করছে। এমন সময় মিঃ কিসোর গাড়ি এসে থামলো পুলিশ অফিসের সম্মুখে।

মিঃ কিসো এবং তাঁর সহকারী গাড়ি থেকে নেমে পুলিশ অফিস কক্ষে প্রবেশ করলেন।

যে মুহূর্তে মিঃ কিসো আসন গ্রহণ করবেন ঠিক ঐ মুহূর্তে একখানা ছোরা এসে গেঁথে গেলো তাঁদের সম্মুখস্থ টেবিলে।

অফিসকক্ষের সবাই চমকে উঠলেন একসঙ্গে। দু'চোখ কপালে উঠেছে সবার। হঠাৎ এই পুলিশকক্ষে কে ছোরা নিক্ষেপ করলো, বিস্ময়কর ব্যাপার!

ছোরাখানা তুলে নিলেন মিঃ কিসো আসন গ্রহণ না করেই। ছোরাখানায় গাঁথা একটি চিঠি। চিঠিখানা খুলে নিলেন মিঃ কিসো নিজের হাতে ছোরা থেকে। চিঠিখানা মেলে ধরে এক নিঃশ্বাসে পড়লেন। চিঠি পড়া শেষ করেই আশ্চর্য এবং বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললেন তিনি—যাকে আমরা জাহাজ 'হীরক হার' থেকে গ্রেপ্তার করে এনেছি সে নাকি দস্যুরাণী নয়!

অফিস কক্ষমধ্যে যেন একটা বিস্ময় জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠলো, সবাই একসঙ্গে বলে উঠলো, যাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে সে দস্যুরাণী নয়।

বললেন মিঃ কিসো—না। চিঠিখানা তিনি টেবিলে মেলে ধরলেন।

ঐ মুহূর্তে শোনা গেলো বাইরে একটি হট্টগোলের শব্দ।

একজন পুলিশ ছুটতে ছুটতে এসে জানালো—স্যার, দস্যুরাণী ধরা পড়েছে স্যার, দস্যুরাণী ধরা পড়েছে.........

দস্যুরাণী! বলো কি তুমি.........সবাই যখন হতভম্ব তখন তিনচারজন রাইফেলধারী পুলিশ শিকারের ড্রেসে সজ্জিত, পিঠে রাইফেল বাঁধা কোমরের বেল্টে সূতীক্ষ্ণধার ছোরা, একটি তরুণীকে পাকড়াও করে নিয়ে এলো।

তরুণী নির্বাক!

তরুণীর মুখের নীচ অংশে কালো রুমাল বাঁধা।

মিঃ কিসো এগিয়ে এলেন—কে তুমি?

তরুণী নির্বাক।

একজন পুলিশ বলে উঠলো—স্যার, এই তরুণী পুলিশ অফিসের যে উঁচু প্রাচীর আছে তার আড়ালে আত্মগোপন করে একটি ছোরা নিক্ষেপ করেছে, আমরা নিজের চোখে দেখেছি। ছোরাখানা নিক্ষেপ করে সে যে মুহূর্তে সরে পড়তে যাচ্ছিলো ঐ মুহূর্তে আমরা তাকে গ্রেপ্তার করেছি। এই

তরুণী নিজে স্বীকার করেছে সে নাকি দস্যুরাণী আর যাকে স্যার বন্দী করে এনেছেন তার নাম লুসি।

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বললো পুলিশটি।

মিঃ কিসো এবং অন্যান্য সবার চোখেমুখেই বিস্ময়। হাঁ, মিঃ কিসোর কাছে দস্যুরাণীর যে বর্ণনা আছে এই তরুণীর হুবহু মিল আছে।

মিঃ কিসো বললেন—ঠিক ধরেছো, এই তরুণীই স্বয়ং দস্যুরাণী। যাকে আমরা বন্দী করেছি সে দস্যুরাণী নয়।

মিঃ কিসোর কথায় পুলিশ মহলের সবাই হতভম্ব হয়ে যান। এ যে এক চরম বিস্ময় তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

এ ব্যাপার নিয়ে পুলিশ অফিসে ভীষণ একটা তোলপাড় শুরু হলো। সাংবাদিক আর ফটোগ্রাফারগণ এবার ভিড় জমলো জেলের সম্মুখভাগ ছেড়ে পুলিশ অফিসের সম্মুখে।

অল্পক্ষণেই জনসমুদ্রে পরিণত হলো পুলিশ অফিস প্রাঙ্গণ।

❑

দিপালীসহ পাগল উধাও হবে, এ যেন রশিদ হায়দার আর ইমরান ভাবতেই পারেনি। পাগলটিকে তারা বিশ্বাস না করলেও অবিশ্বাসের কিছু ছিলো না কারণ পাগল সে পাগলই। তবু কড়া পাহারার ব্যবস্থা ছিলো তার উপর।

এত সাবধান সতর্ক থাকার পরও এমন হলো। সর্বনাশ হয়েছে তাদের, কারণ দিপালীকে নিয়ে ছিলো তাদের অনেক কারসাজি। ওকে বশীভূত করে ওর দ্বারা বহু অর্থ উপার্জন করা সম্ভব হবে তাতে কোনো সন্দেহ ছিলো না। দিপালী চুরি হয়েছে, এ কারণে সরাইখানায় বেশ একটা হুলুস্থুল পড়ে গেছে। পাগলটাকে নিয়ে এসেছিলো তিমিজা। কাজেই সবাই তিমিজাকে ধরে বসেছে কঠিনভাবে।

তিমিজাকে একটা থামের সঙ্গে পিছমোড়া অবস্থায় বেঁধে কশাঘাত করা হচ্ছে। সম্মুখে এবং ওর চারপাশ ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন। এরা সবাই রশিদ হায়দারের লোক।

ইমরান নিজ হাতে তিমিজার দেহে কশাঘাত করে চলেছে। ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করেছে রশিদ হায়দার ও ইমরান। সমস্ত রাত ওরা মদের নেশায় চুর ছিলো, তাই পাগল কখন দিপালীসহ উধাও হয়েছে তা তারা কেউ জানে না বা জানতে পারেনি।

শুধু রশিদ হায়দারই নয়, সরাইখানার মালিকসহ তিমিজা পর্যন্ত মদের নেশায় আত্নহারা হয়ে পড়েছিলো। পাগল হয়তো সেই সুযোগের সাহায্য গ্রহণ করেছে।

ইমরানের কশাঘাতে জর্জরিত হয়েছে তিমিজার দেহ। চামড়া কেটে রক্ত ঝরছে তবু সে বলতে পারছে না কিছু। চিৎকার করে কাঁদবে তারও কোনো উপায় নেই। রুমাল দিয়ে মুখ এঁটে বাঁধা রয়েছে।

রশিদ হায়দার ফিরে যাবার কথা ছিলো কিন্তু যাওয়া তার হয়নি, কারণ ভোরবেলা যখন দেখলো শিকার দুটো উধাও হয়েছে, তখন ইমরানের সঙ্গে তারও মাথায় বাজ পড়েছিলো। কান্দাইয়ে তাদের গোপন আড্ডাখানায় ফিরে না গেলে বিশেষ অসুবিধা হবে জেনেও যেতে পারেনি ঐ সময়। কিন্তু তার বহু চাল ট্রাক বোঝাই হয়ে চালান যাবে এটাতো আর বন্ধ করা যায় না। কারণ সীমান্তের ওপারে যারা মাল ক্রয় করবে তারা মোট অর্থের এক তৃতীয়াংশ আগেই দিয়ে বসে আছে, বাকিটা দেবে মাল পাঠানোর পর কাজেই রশিদ হায়দার এ ব্যাপারে নিশ্চুপ থাকতে পারে না। ফোনে সে মাল পাঠানোর নির্দেশ দিয়ে দেয় তার সহকারীদের কাছে।

তিমিজার উপর যখন অত্যাচার চলছিলো, তখন রাত দুটো হবে। এটা অবশ্য দিপালী ও পাগলটা উধাও হবার পরের রাত। এই রাতের প্রারম্ভেই চালভরা ট্রাকগুলো ওপারের দিকে যাচ্ছিলো। রশিদ হায়দার দিপালী হারানো ব্যাপারে যতটা হতাশায় মুষড়ে পড়েছিলো, মনে মনে তার চেয়ে বেশি

আনন্দিত হচ্ছিলো, কারণ যে চালগুলো আজ সে ওপারে চালান দিতে সক্ষম হয়েছে তাতে তার আসছে কয়েক লক্ষ টাকা।

তিমিজার উপর অকথ্য অত্যাচার দেখে সে মৃদু মৃদু হাসছিলো। তিমিজা যদিও তাদেরই দলের লোক তবু তাকে রেহাই দিলো না শয়তান ইমরান।

কশাঘাতের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হলো ওর দেহটা। রক্ত গড়িয়ে পড়ছে দেহ থেকে। হাত দু'খানা পিছমোড়া অবস্থায় বাঁধা থাকায় সে একটুও নড়তে পারছে না।

একসময় নেতিয়ে পড়লো তিমিজা—ঘাড়টা কাৎ হয়ে গেলো একপাশে, চোখ দুটো উল্টে গেলো উপর দিকে।

ইমরানের হাতে চাবুক থেমে গেলো এবার। ইমরান কুকুরগুলোকে ছেড়ে দিলো। কুকুরগুলো বিপুল উদ্যমে প্রতীক্ষা করছিলো। তাজা মানুষের মাংস ভক্ষণ করে কুকুরগুলো ভয়ঙ্কর হিংস্র হয়ে উঠেছে। মুক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে তিমিজার অর্ধমৃত দেহটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

ঠিক ঐ মুহূর্তে টেবিলে ফোন বেজে উঠলো।

রিসিভার হাতে তুলে নিলো রশিদ হায়দার। সঙ্গে সঙ্গে তার হাত থেকে রিসিভার পড়ে গেলো নিচে।

ইমরান ফিরে তাকিয়ে অবাক হলো এবং ধরে ফেললো রিসিভারখানা। রিসিভার মুখে রেখে বললো ইমরান.........কে.........কে বলছো.........

ওপাশ থেকে ভেসে এলো গম্ভীর ভারী গলার, আওয়াজ......... দস্যু বনহুর বলছি.........কেউ পালাতে চেষ্টা করো না, করলেই মরবে.........

ইমরান রিসিভার ছেড়ে দেয়, সঙ্গে সঙ্গে রশিদ হায়দারকে লক্ষ্য করে বলে—কে ফোন করেছিলো আপনার কাছে?

রশিদ হায়দার দু'চোখ কপালে তুলে ঢোক গিলে বলে—দস্যু বনহুর! সে বললো সীমান্তের ওপারের উদ্দেশ্য যে চাল আমি পাঠিয়েছিলাম, সেই চালসহ ট্রাকগুলো হাইজ্যাক হয়ে গেছে.........

হাইজ্যাক!

হাঁ, দস্যু বনহুর আমাদের সর্বনাশ করেছে ইমরান, সর্বনাশ করেছে। আমাদের চালভরা ট্রাকগুলো সে হাইজ্যাক করে নিয়ে সব হিন্দলের দুঃস্থ জনগণের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছে। ভয় দেখিয়েছে আমাদের সে শায়েস্তা করবে।

হায়দার সাহেব, আমি প্রথমেই বলেছিলাম, এভাবে প্রকাশ্য মাল না পাঠিয়ে গোপনে পাঠালে এতগুলো টাকার মাল ও মুহূর্তে হারাতেন না। সবকিছু গোপনে করতে হয় সাহেব গোপনে......

হায়দার আলী বলে উঠে—মাল গেছে বড় দুঃখ কিন্তু তার চেয়ে বড় দুঃখ দস্যু বনহুর আমাদের সন্ধান জেনে নিয়েছে। নাহলে সে কেমন করে জানবে আমরা এখন এখানে আছি.........

রশিদ হায়দারের কথা শেষ হয় না, একদল পুলিশসহ মিঃ হেলালী প্রবেশ করেন সেই কক্ষে।

সবার হাতে আগ্নেয়াস্ত্র।

মিঃ হেলালী সর্বাগ্রে, তিনি বললেন—হ্যান্ডস্‌আপ.........

কিন্তু মুহূর্তে সম্মুখে একরাশ ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়লো। পুলিশমহলের যারা ঐ মুহূর্তে সেখানে ছিলেন সবাই ভীষণভাবে হাঁচি দিতে শুরু করলেন। চারদিকে শুধু ধোঁয়া, মিঃ হেলালী দু'হাতে মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে রইলেন।

একটু পরে ধীরে ধীরে ধুম্ররাশি পরিষ্কার হয়ে গেলো, কিন্তু পুলিশবাহিনী স্পষ্ট দেখলো কক্ষমধ্যে জীবন্ত অবস্থায় কোনো শয়তান তখন সেখানে নেই, শুধু একটি রক্তাক্ত মৃতদেহ ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় থামের সঙ্গে ঝুলছে।

কুকুরগুলো সরে পড়েছে ইমরান ও রশিদ হায়দারের সঙ্গে সঙ্গে।

মিঃ হেলালী এবং পুলিশ অফিসার ও পুলিশগণ বিস্ময় নিয়ে দেখলেন, এ এক জীবন্ত নরকমুন্ড। যে রক্তাক্ত দেহটা তাঁদের সম্মুখে ঝুলছে, সেটার সমস্ত দেহের মাংস তুলে নেওয়া হয়েছে। কুকুরগুলো যে তিমিজার অবস্থা এমন করেছে তা জানেন না পুলিশ অফিসারগণ। সমস্ত কক্ষ তন্ন তন্ন করে সন্ধান করেও তাঁরা একটি প্রাণীকেও দেখতে পেলেন না। শুধু সরাইখানাময়

ছড়িয়ে আছে নানারকম আসবাবপত্র। নানারকম খাদ্যসম্ভার এবং বহুসংখ্যক মদের বোতল।

মিঃ হেলালী যেন সরাইখানাটির সর্বত্র সবকিছু চেনেন, তেমনিভাবে সন্ধান চালিয়ে চললেন। মিঃ হেলালী সরাইখানায় হানা দিয়েই প্রথমে সরাইখানার মালিকসহ কয়েক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছিলেন। তারপর তিনি গোপন এক সুড়ঙ্গপথে নেমে গিয়েছিলেন নিচে সেই গোপনকক্ষে, যেখানে শয়তান রশিদ হায়দার এবং তার প্রধান সহকারী ইমরান তিমিজাকে অকথ্য নির্যাতন করে হত্যা করেছিলো।

যদিও রশিদ হায়দার এবং ইমরান দস্যু বনহুরের ফোন পেয়ে ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিলো, তবু তারা মিঃ হেলালীর উপস্থিতিতে দ্রুত আত্মগোপন করার পথ করে নিতে সক্ষম হয়েছিলো। যেমন ধূর্ত শিয়াল শিকারী কুকুরের সন্ধান পেলেই গর্তের মধ্যে লুকিয়ে পড়ে, তেমনি ওরাও সরে পড়েছিলো। সুচতুর রশিদ হায়দার সর্বক্ষণ তার সঙ্গে গ্যাস পাম্প রাখতো এবং সেই গ্যাস পাম্প দ্বারা আত্মগোপনের সুযোগ নিতো।

মিঃ হেলালী ব্যর্থ হলেন আসল দৃষ্কৃতিকারী দু'জনকে গ্রেপ্তার করতে। তবু তিনি হতাশ হলেন, না, সন্ধান চালিয়ে গোপন গুদাম থেকে বহু চোরাই মাল উদ্ধার করলেন।

❑

সর্দার, ট্রাকগুলো হিন্দল সুড়ঙ্গের অদূরে গভীর খাদের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়েছি।

বেশ করেছো কায়েস, গাড়িগুলো খাদে ডুবিয়ে দিয়ে ভালই করেছো। যে গাড়ি দেশের জনগণের মুখের অন্ন কেড়ে অপর দেশে নিয়ে যায় অমন গাড়ি নাইবা থাকলো।

সর্দার, গাড়ির চালকদের বন্দী করে এনেছি।

তাদের বন্দী করে আনার কোনো প্রয়োজন ছিলো না কায়েস, কারণ চালকগণ সম্পূর্ণ নির্দোষ না হলেও তারা ঠিক দোষী নয়। ওদের কাল শহরে পৌছে দেবার ব্যবস্থা করো। হাঁ মনে রেখো, আস্তানার বাইরে নিয়ে যাবার সময় তাদের চোখ কালো কাপড়ে ভালভাবে বেঁধে তারপর নিয়ে যাবে।

আচ্ছা সর্দার, আপনার আদেশমতই কাজ করবো।

সর্দার!

কে?

আমি।

কে নাসরিন?

হাঁ সর্দার।

বলো?

নূরী অসুস্থ, তাই......

নূরী অসুস্থ! কই আগেতো শুনিনি?

হঠাৎ সে ঝরণার ধারে পা পিছলে পড়ে গিয়ে ব্যথা পেয়েছে। বড্ড অসুস্থ বোধ করছে, এক্ষুণি চলুন।

যাও আসছি।

নাসরিন দরবারকক্ষ থেকে বেরিয়ে যায়। সোজা সে এসে হাজির হয় নূরীর কক্ষে।

নূরী বিছানায় শুয়েছিলো।

চাদরে তার দেহ ঢাকা রয়েছে। চুলগুলো এলোমেলো ছড়িয়ে আছে বালিশের উপরে। কয়েকগোছা কোঁকড়ানো চুল কপালে লুটোপুটি খাচ্ছে।

বড় সুন্দর লাগছে ওকে।

নাসরিন এসে বসে ওর পাশে—চুপ করে শুয়ে থাকবে নূরী, সর্দার যেন বুঝতে না পারে তোমার কিছু হয়নি।

নূরী বলে—নাসরিন, কি বলেছিস্ তুই ওকে?

বলেছি ঝরণার ধারে পা পিছলে পড়ে খুব ব্যথা পেয়েছো, বাস্ এইটুকু.........

কি বললো সে?

বললো যাও আসছি। নূরী, তুমি চোখ বন্ধ করে চুপচাপ পড়ে রইবে, আমি কিন্তু আড়াল থেকে সব দেখবো।

নাসরিন, তুই বড্ড দুষ্ট, খবরদার দেখবি না কিন্তু, তাহলে আমি শুয়ে থাকবো না, চলে যাবো এ ঘর থেকে।

তাহলে সর্দারও চলে যাবেন তার কাজে, তখন দেখবে মজাটা.........

কথা শেষ হয় না নাসরিনের, কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে বনহুর।

নাসরিন তার পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যায়।

বনহুর তাকায় নূরীর শয্যার দিকে।

একগুচ্ছ রজনীগন্ধার মত যেন ছড়িয়ে আছে ও শয্যার উপর। অনেকদিন পর নূরীকে যেন বনহুর নতুনভাবে লক্ষ্য করলো। ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালো সে ওর শয্যার পাশে, ডাকলো শান্ত কণ্ঠে—নূরী!

নূরী ইচ্ছা করেই চোখ বন্ধ করে ছিলো, বনহুরের ডাকে ও একটুও নড়লো না বা সাড়া দিলো না। একটা লুপ্ত অভিমান ওর ভিতরে জমাট হয়ে উঠেছে। কেন হুর আস্তানায় এসেও ওর সঙ্গে সাক্ষাৎ না করেই চলে গিয়েছিলো? কেন সে ওকে ডেকে একটি কথাও বলেনি। কই, আগে তো সে এমন ছিলো না। যত ব্যস্তই থাক না কেন, নূরীর সঙ্গে সে সময় করে নিয়ে হাসিগল্পে মেতে উঠতো বনে ঘুরে বেড়াতো, ঝরণায় সাঁতার কাটতো। আর কি হয়েছে সেই লোকটি — যেন সে পাল্টে গেছে একেবারে নতুন এক মানুষের মত আজ নূরীর মনে সমস্ত অভিমান এক হয়ে জটলা পাকাচ্ছে, কিছুতেই সে কথা বলবে না তার সঙ্গে।

কিন্তু একি বনহুর যখন ডাকলো নূরী! নূরী, কথা বলো নূরী, তখন নূরী যেন কিছুতেই নিশ্চুপ থাকতে পারলো না। সমস্ত অভিমান মুছে গেলো ওর হৃদয় থেকে, মেঘমুক্ত আকাশের মত সচ্ছ হয়ে গেলো সব রাগ-দুঃখ-ব্যথা।

চোখ মেলতেই দু'ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়লো নূরীর চোখের কোল বেয়ে।

বনহুর পাশে বসে দু'হাতে ওর গণ্ড চেপে ধরে ব্যাকুলকণ্ঠে বললো—কি হয়েছে নূরী? কি করে তুমি পিছলে পড়ে গেলে বলো? কোথায় ব্যাথা পেয়েছো? বলো নূরী, বলো?

ধীরে ধীরে চোখ মেললো নূরী, কিন্তু সে নীরব রইলো।

বনহুর তখনও ব্যাকুল কণ্ঠে বলে চলেছে—বলো নূরী কোথায় ব্যাথা পেয়েছো, বলো?

নূরী বললো—ও সামান্য, কিছু না।

সত্যি করে বলো নূরী কোথায় লেগেছে তোমার? নিশ্চয় পায়ে হবে, দেখি.........বনহুর নূরীর পায়ে হাত বুলিয়ে পরীক্ষা করে দেখে।

নূরী জানে, সব নাসরিনের চালাকি। নাসরিন ওকে মিথ্যা কথা বলেছে নূরী ঝরণার ধারে গিয়ে ব্যথা পেয়েছে। আসলে সব মিথ্যা—নাসরিন ছলনা করে নূরীকে জোরপূর্বক বিছানায় শুইয়ে দিয়ে ডাকতে গিয়েছিলো সর্দারকে। বলেছিলো কেমন না আসে বা তোমার পাশে না বসে আমি দেখবো। বনহুর যখন নূরীর পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলো তখন নূরী লজ্জায় জড়সড়ো হয়ে পড়ছিলো কারণ সে জানে, নাসরিন বনহুরকে ডেকে দিয়ে আড়ালে আত্নগোপন করে লুকিয়ে সব দেখছে।

নূরী তাই উঠে বসে বললো—পায়ে ব্যথা লাগেনি হুর, তুমি মিছামিছি ব্যস্ত হচ্ছো।

তবে কোথায় পেয়েছো বলো? মাজায় না পিঠে!

কোথাও নয়!

মিথ্যে কথা! অভিমান করেছো নূরী। সত্যি অভিমান করার কথাই বটে, কারণ সেদিন আস্তানায় এসেও তোমার সঙ্গে দেখা না করেই চলে গিয়েছিলাম। নূরী, অপরাধ করেছি তোমার কাছে, আমাকে ক্ষমা করো নূরী.........বনহুর নূরীর দু'খানা হাত দু'হাতের মুঠায় চেপে ধরে কোমল কণ্ঠে বলে।

নূরী সম্পূর্ণ নীরব হয়ে থাকে।

বনহুর ওকে টেনে নেয়, নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে বলে— নূরী, আমাকে ক্ষমা করো.....

নূরী যেন লজ্জায় কুঁকড়ে যায়, কারণ সে জানে আড়াল থেকে দুটি চোখ তাদের লক্ষ্য করছে! বলে নূরী—ছাড়ো, আমি তোমাকে অনেক আগেই ক্ষমা করেছি।

বনহুর তবু ওকে গভীর আবেগে কাছে টেনে নেয়।

নূরী বনহুরের কানে চুপি চুপি বলে—তুমি জানো না হুর, নাসরিন আড়াল থেকে সব লক্ষ্য করছে। আসলে আমি পড়ে যাইনি বা আঘাত পাইনি, সব নাসরিনের চাতুরি।

বনহুর নূরীকে বাহুমুক্ত করে দেয়।

নূরী শয্যা ত্যাগ করে বেরিয়ে যায়, ওপাশে যেখানে নাসরিন দাঁড়িয়েছিলো সেখানে নাসরিন নেই, দূরে দাঁড়িয়ে মৃদু মৃদু হাসছে সে।

নূরী বলে উঠে—খবরদার, দেখবিনা কিন্তু।

নাসরিন হেসে বলে—না না, এই কান ধরে শপথ করছি আর চুপি চুপি দেখবো না।

নূরী ফিরে যায় বনহুরের পাশে।

বনহুর তখন বিছানায় বসে বালিশে হেলান দিয়ে একটি সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করেছে। নূরী কক্ষমধ্যে ফিরে এসে বলে—ওকে তাড়িয়ে দিয়েছি। কথাটা বলে বনহুরের পাশে বসে ওর জামার বোতাম খুলতে থাকে।

বনহুর একমুখ ধোঁয়া ছুড়ে দেয় নূরীর চোখেমুখে।

নূরী ওর নাকটা একটু টিপে দেয়, তারপর হেসে বলে—মনিরা আপার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছো?

না।

সেকি!

সত্যি বিশ্বাস করো সময় পাইনি।

পুরুষ মানুষ এত নিষ্ঠুর হতে পারে জানতাম না। জানো, মনিরা আপা তোমার জন্য কত ব্যাকুল থাকে?

জানি।

জেনেও তুমি......

নূরী, বলেছি সব ইচ্ছাই আমার আছে তবু সব সময় ইচ্ছা আমার পূর্ণ হয় না। জানো নূরী, সেদিন তোমাকে না বলে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করেও কেমনভাবে চলে গেলাম। জানি তুমি ব্যথা পেয়েছিলে কিন্তু কোনো কথা ভাববার সময় আমার ছিলো না।

সেদিন ওভাবে এত তাড়াহুড়া করে কোথায় গিয়েছিলে হুর?

সে এক গভীর রহস্যময় ঘটনা।

কি বলোনা একটু?

হয়তো ঘটনাটা তোমার বা আমার কাছে তেমন রহস্যপূর্ণ নয় তবু আমি জানি, এ এক গভীর রহস্যপূর্ণ ঘটনা। বিদেশ থেকে কোন বন্ধুরাষ্ট্র আমাদের দেশের ভাগ্যহত দুঃস্থ জনগণের জন্য কিছু চাল সাহায্য দিয়েছিলো। জানো নূরী, আমাদের দেশের সৌভাগ্যবান মহান ব্যক্তি যারা তারা সেই চাল গোপনে বিক্রয় করে দিয়েছিলো একদল চোরাচালানী দুস্কৃতিকারীদের কাছে।

তারপর?

আমি দিপালীর উদ্ধারে গিয়ে এই চালের সন্ধান পাই এবং জানতে পারি সেইদিনই চালগুলো ট্রাকভর্তি হয়ে পাচার হচ্ছে সীমান্তের ওপারে। ঐ মুহূর্তে আমাকে প্রস্তুতি নিতে হয়েছিলো, এ চালগুলো কিছুতেই দেশের বাইরে যেতে দেবো না বলে মনস্থির করে নিলাম। আবার দিপালীকেও উদ্ধার করতে হবে......

দিপালী...এই কি সেই দিপালী—হিম্মৎ খাঁর আদরিনী কন্যা মিস দিপালী?

হাঁ। সে এক মৃত্যুযন্ত্রণার মধ্যে কালাতিপাত করছিলো। দিপালীকে উদ্ধার করতে গিয়ে আমাকে বেশ কিছু ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছিলো, তবু আমি কৃতকার্য হয়েছি নূরী।

দিপালীকে উদ্ধার করেছো হুর?

হাঁ নূরী।

চালগুলো?

হাঁ, রিলিফের চালগুলোও আমি উদ্ধার করেছি এবং শত শত হতভাগ্য দুঃস্থ জনগণের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছি।

সত্যি?

হাঁ, সেই কারণেই আমাকে আস্তানায় আসতে হয়েছিলো এবং অনুচরদের প্রস্তুতির ইংগিত দিয়েই চলে যেতে হয়েছিলো। যদি বিলম্ব হতো তাহলে ঐ চালবোঝাই ট্রাকগুলো কান্দাই ছেড়ে চলে যেতো ওপারে। আমি ঠিক সময় পৌছতে পেরেছিলাম বলেই ট্রাকগুলোকে আটক করতে সক্ষম হয়েছিলাম। নূরী, তুমি যদি পাশে থাকতে দেখতে ক্ষুধার্ত জনগণের মধ্যে চালগুলো বিলিয়ে দেবার সময় সেকি আনন্দোচ্ছ্বাস, সেকি বাঁচার অদম্য স্পৃহা!

বনহুরের চোখেমুখে ফুটে উঠে একটা ভাবপূর্ণ গাম্ভীর্যতা। আনমনে কিছু চিন্তা করে চলে সে। নূরী তন্ময় হয়ে তাকিয়ে থাকে সেই সৌম্য সুন্দর দীপ্ত-মুখখানার দিকে।

ও যেন এ পৃথিবীর লোক নয়, সে এক কান্তিময় দেবপুরুষ। যুগ যুগ সাধনার মহাপুরুষ বনহুর। নূরীর মন অভিভূত হয়ে যায়, নির্ণিমেষ নয়নে তাকিয়ে থাকে সে স্বামীর মুখের দিকে।

❑

সর্দার, কাল সমস্ত দিন সে কিছু খায়নি। তাকে কিছুতেই ভুলিয়ে রাখা যাচ্ছে না। সব সময় সে বলছে আমার রাজকুমার কই, আমার রাজকুমার কই......

মোহসিন তুমি যাও, আমি দেখছি!

বনহুর দিপালীর কক্ষের দিকে অগ্রসর হলো। মোহসিন চলে গেলো তার নিজের কাজে।

বনহুর কক্ষমধ্যে প্রবেশ করতেই দিপালী চোখ তুলে তাকালো। হঠাৎ যেন সে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না। রাজকুমারকে চিনতে তার বাকি নেই কিন্তু সে যে তাকে পাগলের বেশে দেখেছিলো। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চোখ দুটো কেমন যেন ম্লান দীপ্তহীন, চুলগুলো রুক্ষ এলোমেলো, দেহের স্থানে স্থানে কাঁদাবালি লেগে আছে, পরনে ছেঁড়া ময়লা বস্ত্র। কিন্তু এখন সেই পাগলবেশ কোথায়, সুন্দর বলিষ্ঠ দীর্ঘদেহ পুরুষ তার রাজকুমার। দিপালী ধীরে ধীরে মোহগ্রস্তের মত উঠে দাঁড়ায় শয্যা ত্যাগ করে।

বনহুর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সেও অবাক চোখে না হলেও কিছুটা বিস্ময় নিয়ে দেখছে। দিপালী কাল থেকে কিছু মুখে করেনি। রাজকুমারের জন্য সে পাগলপ্রায় হয়ে উঠেছে। বনহুর স্থিরদৃষ্টি নিয়ে দিপালীকে দেখছে।

দিপালী এগিয়ে আসে, মুখে ওর উচ্ছল আনন্দ ঝরে পড়ছে। সত্যি সে তার রাজকুমারকে দেখতে পাচ্ছে......এ মিথ্যা নয়, কারণ সে ঘুমিয়ে নেই জেগে আছে। দিপালী কিছুটা এগিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে বনহুরের বুকে—রাজকুমার তুমি এসেছো?

বনহুর ওকে দু'হাতে সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলে—দিপালী, তুমি ভুল করছো, আমি রাজকুমার জ্যোতির্ময় নই।

মিথ্যে কথা! সব মিথ্যে কথা আমি জানি তুমি রাজকুমার।

দিপালী বসো, শোনো! বনহুর ওকে খাটের উপর বসিয়ে নিজেও বসে ওর পাশে।

দিপালী নির্বাক নয়নে বনহুরকে দেখছে।

বলে বনহুর—দিপালী, বড় কষ্ট পেয়েছো? ঐ শয়তানদল তোমাকে নিষ্পেষিত করেছে। সব আমি জানি.........

সব জানতে?

হাঁ দিপালী।

তবে কেন আমাকে তুমি আরও আগে উদ্ধার করোনি?

তুমি বিশ্বাস করো দিপালী, নানা কাজের ফাঁকে তোমাকে অবিরাম খুঁজেছি। তোমার সন্ধানে আমার সমস্ত লোক সদাসর্বদা ব্যস্ত ছিলো কিন্তু তোমাকে পাইনি। বহু চেষ্টার পর তোমার খোঁজ পেয়েছিলাম দিপালী, তাই পাগলের বেশে গিয়েছিলাম সে সরাইখানায়।

তুমি তাহলে সত্যি পাগল ছিলে না?

হেসে বলে বনহুর—না, ওটা আমার মিথ্যা অভিনয়।

রাজকুমার!

রাজকুমার নয়, দস্যু বনহুর।

না, আমি বিশ্বাস করি না। তুমি মহান, তুমি দেবতা, তুমি......

দিপালী!

রাজকুমার.........দিপালী বনহুরের বুকে মুখ লুকিয়ে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে—তুমি দস্যু হতে পারো না। আমি তা বিশ্বাস করি না। দস্যু ঐ নরপশুর দল, যারা দিনের পর দিন আমার উপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছে, যারা আমাকে নিষ্পেষিত করেছে, আমাকে যারা শুধু লালসার সামগ্রী হিসেবে ব্যবহার করেছে......তারা, তারাই দস্যু—তারাই শয়তান জল্লাদ......তুমি দস্যু হতে পারো না, তুমি দেবতার চেয়েও পবিত্র......

দিপালী গলায় কাপড় জড়িয়ে বনহুরের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে।

বনহুর ওকে তুলে দাঁড় করিয়ে দেয়, স্থির চোখে তাকিয়ে থাকে দিপালীর সুন্দর কোমল মুখখানার দিকে।

দিপালীর গন্ড বেয়ে তখন গড়িয়ে পড়ছিলো ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু, ঠিক যেন এক একটি মুক্তাবিন্দু।

বনহুর বললো...দিপালী, তুমি বড় অসুস্থ। এখন বিশ্রাম করো, আবার আসবো। হাঁ শুনলাম তুমি কিছু মুখে দাওনি কাল থেকে?

দিপালী নীরব।

বনহুর বললো—যদি সম্মুখের খাবার আজও অমনি পড়ে থাকে তবে আমি আর আসবো না।

দিপালী বললো—আমি খাবো, সব খাবো, তবু বলো তুমি আসবে? বলো আসবে?

আচ্ছা, তুমি ঠিকমত খেও, আমি আসবো। দিপালীর মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বেরিয়ে যায় বনহুর।

একটু পরে সেই কক্ষে প্রবেশ করে মোহসিন। দিপালীকে লক্ষ্য করে বলে—রাজকুমার এসেছিলে বুঝি?

দিপালী বললো—হাঁ, এসেছিলো।

বেশ, এবার তাহলে খাবারগুলো খেয়ে নিতে আপত্তি নেই তো?

দিপালী এবার কোনো কথা না বলে খেতে শুরু করলো, ওর চোখেমুখে ফুটে উঠেছে আনন্দদীপ্ত ভাব।

মোহসিন বললো—আজ আপনাকে বড় প্রফুল্ল মনে হচ্ছে মিস দিপালী! রাজকুমারকে আপনি সত্যি ভালবাসেন, তাই না?

হাঁ, তাকে আমি নিজের জীবনের চেয়ে বেশি ভালবাসি কিন্তু......

বলুন কিন্তু কি?

তাকে আমি দেবতার মত শ্রদ্ধা করি। আপনি কে এবং কি করেন এখানে?

আমি তাঁর কর্মচারী, কাজ করি এখানে।

আপনার মত আরও অনেককে দেখতে পাই, তারা কি সবাই এখানে কাজ করে?

হাঁ, তারাও আমার মত।

রাজকুমার কি করেন?

বলতে মানা আছে।

দিপালী হেসে বলে—আপনারা না বললেও রাজকুমার আমাকে বলেছেন। তিনি নাকি দস্যু? কিন্তু জানেন, আমি মোটেও তাঁর কথা বিশ্বাস করি না, কারণ দস্যু কোনোদিন এমন মহৎ মহান চরিত্রবান হয় না, তারা জানে শুধু ছিনিয়ে নিতে.........

কিন্তু আমাদের সর্দার ছিনিয়ে নিয়ে বিলিয়ে দেন, তাঁর কোনো লোভ বা মোহ নেই।

জানি, আমি সব জানি।

এমন সময় একজন অনুচর এসে বলে— মোহসিন ভাই, এদিকে এসো, জরুরি একটা কাজ আছে।

বেরিয়ে যায় মোহসিন।

দিপালী ভাবতে থাকে রাজকুমারের কথা।

এখানে যখন দিপালী বনহুরের কথা ভাবছে তখন কান্দাইয়ে রশিদ হায়দারের গোপন আস্তানায় রশিদ হায়দার এবং ইমরান আলী ভেজা নেকড়ে বাঘের মত গিয়ে উপস্থিত হয়।

মিঃ হেলালী পুলিশবাহিনী নিয়ে যখন সরাইখানা ঘেরাও এবং তল্লাশি চালিয়েছিলেন ঐ মুহূর্তে দিশেহারা হয়ে রশিদ হায়দার ও ইমরান ময়লা নিকাশের গহ্বরে আত্মগোপন করে ভূতলের নর্দমা দিয়ে হামাগুড়ি কেটে প্রায় দীর্ঘ সাত মাইল পথ অতিক্রম করে এসে হাজির হয়েছিলো তার আস্তানায়।

যখন রশিদ হায়দার এবং ইমরান আলী আড্ডাখানায় এসে পৌছলো তখন তাদের অবস্থা শোচনীয়। সমস্ত শরীরে দুর্গন্ধ, চোখেমুখে মাথায় শুধু ময়লা নয়, মানুষের পায়খানা মাখানো রয়েছে।

এহেন অবস্থায় তাদের চেহারা বুনো শূয়োর কিংবা ভিজে নেকড়ে বাঘের সঙ্গে তুলনা করা যায়। আস্তানায় পৌছতেই তার দলবল তাদের অবস্থা দেখে হাসবে কি কাঁদবে ভেবে পাচ্ছে না। তারা নাকে কাপড় চাপা দিয়ে দেখছে। যেন ওরা তামাশা দেখছে মানে মালিকের অবস্থা দেখে ভয়ও পাচ্ছে, অবাকও হচ্ছে। কেউ কোনো প্রশ্ন করার সাহসও পাছে না, কারণ তাদের চোখমুখ এক ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে।

গর্জে উঠলো রশিদ হায়দার—কি দেখছো তোমরা, শিগ্গির সাবান এবং গরম পানি নিয়ে এসো।

ইমরানও ধমক দিলো—হতভাগা শয়তান, তোরা তামাশা দেখছিস, যা, উনি যা বললেন সেগুলো নিয়ে আয়।

কেউ কোনো কথা জিজ্ঞাসা করবার সাহস পেলো না। সবাই ছুটলো সাবান আর পানি আনতে।

সাবান আর গরম গরম পানি দিয়ে যতই স্নান অর্থাৎ গোসল করুক ওরা তবু কিছুতেই দেহ থেকে ময়লার গন্ধ যাচ্ছে না। প্রায় ঘন্টা চারেক ধরে চার-পাঁচটা মূল্যবান সাবান মেখেও যখন নাকমুখ থেকে গন্ধ দূর হলো না, তখন আতর আর গোলাপ জলের বোতল এলো হাজার হাজারটা। গোলাপ জলে স্নান করলো ওরা দু'জন খুব করে।

তবু কি আর গন্ধ যায়!

চুলে নাকে কানের মধ্যে জমে আছে পায়খানার ময়লার দুর্গন্ধ।

রাগে গস্‌গস্‌ করে চললো শয়তান রশিদ হায়দার ও ইমরান আলী। তখনই রিসিভার তুলে নিয়ে ফোন করলো রশিদ হায়দার রিলিফ কমিটি প্রধানের কাছে। তাঁর দেওয়া মাল পথের মাঝে লুটতরাজ হয়ে গেছে, পুলিশমহল দুস্কৃতিকারীদেরকে গ্রেপ্তার করা দূরের কথা, তাদের কোনো সন্ধান না করে পাল্টা তাদের সরাইখানায় হানা দিয়ে সবগুলো লোককে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে এবং তাদের সরাইখানার গুদামে যে মাল মজুত ছিলো তাও আটক করেছে।

সংবাদ শুনে মহান নেতা রিলিফকমিটি প্রধানের চক্ষু রক্তবর্ণ ধারণ করলো। একটু আধটু নয় প্রায় তিন কোটি টাকার মাল পথের মধ্যে দুস্কৃতিকারী লুটে নিয়েছে—কে তারা এমন দুঃসাহসী, তাঁর মাল বোঝাই ট্রাকে হস্তক্ষেপ করেছে! যেহেতু তাঁর নিজহস্তের নাম সহি করা চিঠি ছিলো মালবাহী ট্রাকের ড্রাইভারদের কাছে, তাই কারও সাধ্য নেই এ মাল আটক করে বা ছিনিয়ে নেয়। তিনি যেন ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে চাইছিলেন না, কারণ এ কাজ তিনি বহুদিন যাবৎ করে আসছেন। কান্দাই ছাড়াও বিদেশে তিনি দশ কোটি টাকা মূল্যে বাড়ি ক্রয় করে রেখেছেন। বিদেশী ব্যাঙ্কে আছে কয়েক কোটি টাকা অথচ এবার তাঁকে নাকানি-চুবানি খেতে হলো।

রিলিফ কমিটি প্রধান যাদের দ্বারা এ পথ সুগম করে নিয়েছিলেন তাদের কাছে কৈফিয়ত তলব করে বসলেন। তারা নেতার আদেশ মতই কাজ

করে, কারণ তারা রিলিফ কমিটির অন্যান্য সাধারণ ব্যক্তি বিশেষ। মহাপরিচালকের ইঙ্গিতেই তো তারা উঠে বসে, যা দু'দশ মণ এদিক ওদিক করে। হঠাৎ প্রধানের ফোন পেয়ে পিলে চমকে যায়, তাদের হুশ হয়! তখন তাদের বানর নাচের অবস্থা দাঁড়ায়।

কেউ ছুটলো পুলিশ অফিসে, কেউ ছুটলো অফিসারদের বাড়ি, কেউ ছুটলো পুলিশ প্রধানের কাছে।

নেতা মহাশয় কান্দাই পুলিশ প্রধানকে ফোন করে জানালেন, কান্দাইয়ের সীমান্তের সরাইখানা থেকে গত পরশু যে মাল আটক করা হয়েছে সে মাল এখনই মুক্ত করে দেওয়া হোক এবং যাদের বন্দী করে আনা হয়েছে তাদের মুক্তি দেওয়া হোক এবং কে তিনি, কি নাম, সেই পুলিশ অফিসারের যিনি সেই সরাইখানায় উপস্থিত হয়ে এসব কাজ করেছেন, তাঁকে সাস্‌পেন্ড করা হোক।

মিঃ জায়েদী হলেন কান্দাই পুলিশ প্রধান। তিনি ন্যায় ও নীতিবান মানুষ। তিনি অনেকদিন হলো দেশের এই চরম অবনতি লক্ষ্য করে এসেছিলেন। সব জানেন তিনি, তবু নীরব থাকেন কারণ তাদের উপরওয়ালা ব্যক্তিগণ দেশের এই চরম অবস্থা সৃষ্টি করছেন তাই তিনি নীরব থাকা ছাড়া কোনো উপায়ন্তর খুঁজে পান না।

মিঃ জায়েদী আরও বোঝেন দেশের হর্তাকর্তাদের অংগুলি হেলনে আজ পুলিশমহল উঠছে-বসছে সব কিছু করছে। বিবেকের বিরুদ্ধে তাঁকেও অনেক নির্দেশ মেনে চলতে হয়েছে। মনপ্রাণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে কিন্তু কি করবেন, তিনি যে চাকরি করেন।

ন্যায়নীতি মেনে চললে নাকি পুলিশের চাকরি করা যায় না, তার প্রমাণ তিনি বিশ বছর চাকরির অভিজ্ঞতায় হাড়ে হাড়ে জেনেছেন। সরকারের নির্দেশ মেনে চলতেই হবে। কাজেই সরকারের সরকার নামধারী স্বনামধন্য ব্যক্তিরা যেভাবে চলতে বলবেন সেইভাবে চলতে হবে, নইলে চাকরি থাকবে না।

আজ রিলিফ প্রধানের ফোন পেয়ে তিনি ম্লান হাসি হাসলেন। তিনি জানতেন, এই মহান  ব্যক্তিই দেশে কত ক্ষতিসাধন করে চলেছেন। অবশ্য সর্বসাধারণ কেউ জানে না বা বুঝে না। আর তারা বুঝবেই বা কি করে, তারা যে সাধারণ মানুষ।

লক্ষ লক্ষ বা হাজার হাজার টাকার মাল নয়, বিদেশ থেকে কোটি কোটি টাকার রিলিফ এসেছিলো দেশের ভাগ্যহতদের জন্য। যে সাহায্যদ্রব্য দেশের দুঃস্থ জনগণের জন্য এসেছিলো তা যদি ন্যায়ভাবে বিতরণ হতো তাহলে আজ সত্যি সত্যি দেশের এ চরম অবস্থা হতো না। ভাবেন মিঃ জায়েদী কিন্তু ভেবে কি হবে, কিইবা করবার আছে তাঁর। রিলিফ প্রধান তাঁর প্রয়োজনমত আত্মসাৎ করার পর যা থাকে তা ছেড়ে দেন বিভিন্ন শহরের রিলিফ প্রধানদের হাতে ,তাঁরা নিজেদের প্রয়োজন পূরণ করে বাকি ছেড়ে দেন তাঁদের সহকারীদের হাতে। সহকারীরা স্বল্প বেতনভোগী কর্মচারী—নিয়ত অভাবের সঙ্গে বোঝাপড়া করেন, কাজেই তাঁরা নিজেদের প্রয়োজনে আত্মসাৎ করেন যতটুকু পারেন, তারপর কিঞ্চিৎ যা থাকে তাই বিলি করেন পরিচিত জনদের মধ্যে। সত্যি যারা দুঃস্থ অসহায়, যাদের প্রয়োজনে রিলিফ সামগ্রী বিদেশী মহাত্মগণ পাঠিয়েছিলেন, আসলে সেই দুঃস্থ গরিব বেচারাদের ভাগ্যে কিছুই জোটে না।

পুলিশ প্রধান মিঃ জায়েদীর মন মাঝে মাঝে বিষিয়ে উঠে। তিনি সব বুঝেন, জানেন, জেনেও তাঁকে নীরবে বহু অন্যায়কে সমর্থন করতে হয়।

আজ যখন কেন্দ্রে রিলিফ প্রধানের ফোন পেলেন তখান তিনি চুপ থাকতে পারলেন না। আর চুপ থাকবেনই বা কি করে! কর্মকর্তাদের আদেশ তাঁকে মেনে চলতেই হবে। তখনই তিনি পুলিশ অফিসে ফোন করলেন এবং জানালেন কান্দাই সীমান্তে গত পরশু মিঃ হেলালী হানা দিয়ে যে ব্যক্তিদের ধরে এনেছেন তাদের মুক্তি দেওয়া হোক। এ ছাড়াও সেখানে সেই সরাইখানা থেকে যে চোরাইমাল উদ্ধার করা হয়েছে ঐ মালও ফেরত দেওয়া হোক।

পুলিশ প্রধানের হুকুম, কাজেই কোনো জিজ্ঞাসাবাদের সাহস পান না, নির্দেশমত কাজ করেন তাঁরা।

মিঃ হেলালী স্তম্ভিত হলেন কিন্তু টু শব্দটি তিনি করতে পারলেন না, কারণ উপরওয়ালাদের ইংগিতে সব হচ্ছে এবং চলছে।

দেশের অন্যায়ের বিরুদ্ধে বলবার কিছু নেই, করবারও কিছু নেই। সব দেখেও সব জেনেও নীরব থাকতে হবে। আপন মনে কথাগুলো উচ্চারণ করলেন মিঃ হেলালী নিজের কক্ষের মেঝেতে পায়চারী করতে করতে।

ঠিক পিছন থেকে গম্ভীর পরিচিত কণ্ঠস্বর—না, নীরব থাকা আর চলবে না।

কে?

আমি দস্যু বনহুর।

আপনি!

হাঁ আমি। মিঃ হেলালী, অন্যায়ের বিরুদ্ধে বলবার কিছু নেই, করবারও কিছু নেই, কাজেই নীরব থাকতে হবে, তাই না?

এছাড়া আর কি উপায় আছে আমাদের বিশেষ করে যারা আমরা সরকারি চাকরি করি। পেটের দায়ে আমরা এসেছি চাকরি করতে, কাজেই.........

জানি মিঃ হেলালী, চাকরি ছাড়া আপনাদের যখন গত্যন্তর নেই তখন নীরবই থাকতে হবে। কিন্তু যারা কারও গোলাম নয়, যারা দেশের সর্বসাধারণ তারা কি নীরব থাকবে মনে করেন? কিছুতেই না, এমন কোনো শক্তি নেই যা তাদের কণ্ঠ রুদ্ধ করে দিতে পারে। কামানের গোলাও কোনদিন তাদের কণ্ঠ স্তব্ধ করে দিতে পারবে না। হয়তো বা শত শত প্রাণ হারাবে কিন্তু জন্মলাভ করবে লক্ষ লক্ষ মানুষ। অন্যায় চিরদিন অন্যায়। মিঃ হেলালী আপনি নীরব থাকলেও আমি নীরব থাকবো না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে যদি আমার মৃত্যু হয়, আমার প্রতিটি রক্তকণা থেকে জন্মলাভ করবে কোটি কোটি সংগ্রামী মানুষ। তারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে, অন্যায়কারীদের দেহের চামড়া ছাড়িয়ে পাদুকা তৈরি করবে।

অন্যায়কারীরা যতই সাধুতার মুখোশ পরে থাকুক না কেন, একদিন সে মুখোশ তাদের খুলে পড়বেই পড়বে—অন্যায় কোনোদিন চিরস্থায়ী হয় না, হতে পারে না। মিঃ হেলালী, জানি পুলিশ প্রধান নির্দেশ দিয়েছেন গত পরশু যাদের সীমান্ত এলাকার সরাইখানা থেকে গ্রেপ্তার করে আনা হয়েছে তাদের মুক্তি দিতে হবে আর যে চোরাই মাল সরাইখানা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে তা ফেরত দিতে হবে। পুলিশ প্রধানের নির্দেশ অমান্য করবার যো নেই, কাজেই...একটু থেমে বলে বনহুর—অবশ্য পুলিশ প্রধান নির্দেশ পেয়েছেন তার উপরওয়ালাদের কাছ থেকে। হাঁ, মুক্তি ওরা পাবেই এবং সেই সরাইখানা থেকে উদ্ধারকৃত মজুত মালও ছাড়া পাবে, যেমন যুগ যুগ ধরে চলে আসছে অনাচার অবিচার......এবার বনহুর আরও বেশি গাম্ভীর্য নিয়ে বলে—কিন্তু, অনাচার অবিচার বন্ধ করতে হবে, বন্ধ করতে হবে নেতৃস্থানীয় নেতাদের দাপট। মিঃ হেলালী, আপনি পুলিশ প্রধানের আদেশ পালনে অস্বীকার করুন, আমি আপনাকে সহায়তা করবো।

আপনি......আপনি আমাকে.........

হাঁ, ভয় নেই মিঃ হেলালী, চাকরি আপনার বিনষ্ট হবে না।

চাকরির জন্য আমার কোনো মায়া নেই। আমি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করবো না, কারণ অন্যায়কে আমিও ভীষণ ঘৃণা করি।

জানি মিঃ হেলালী, আর জানি বলেই আমি আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছি। আপনি নিশ্চিত থাকুন, যা করতে হয় আমিই করবো। আসি বন্ধু, কেমন? বনহুর মিঃ হেলালীর সঙ্গে হাত মিলায় তারপর দ্রুত বেরিয়ে যায় পিছন দরজা দিয়ে। সিঁড়িতে শোনা যায় ভারী জুতোর শব্দ।

মিঃ হেলালীর মুখ প্রফুল্ল দেখাচ্ছে এখন। একটু পূর্বে তিনি যেন একেবারে বিপদ সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন। পুলিশ প্রধানের নির্দেশ তাঁকে মানতেই হবে। অন্যায় অনাচারকে প্রশ্রয় দিতেই হবে, কারণ চাকরিজীবি সরকারি কর্মচারী। হর্তাকর্তারা যা বলবেন, তাঁদের নির্দেশ মেনে চলাই হলো তাদের ডিউটি। কিন্তু মিঃ হেলালী অন্যায়কে প্রশ্রয় দেবেন না কোনোদিন, এ কারণে যদি তাঁর চাকুরি চলে যায় ক্ষতি নেই, তবু তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে নিজকে ন্যায়ের স্তম্ভ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবেন।

❑

মিঃ হেলালীর আচরণে স্তম্ভিত হয়েছেন পুলিশ প্রধান। শুধু পুলিশ প্রধান নন আরও অনেকে। পুলিশ প্রধান অবশ্য উপর থেকে নির্দেশের কথাটা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন মিঃ হেলালীকে তবু তিনি একই বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছেন, কিছুতেই অন্যায়কে প্রশ্রয় দেবেন না। তিনি যাদের গ্রেপ্তার করে এনেছেন তাদেরকে কিছুতেই মুক্তি দেবেন না।

কথাটা একসময় রাজধানী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের কানে গিয়ে পৌঁছলো। কান্দাই পুলিশ প্রধানের অনুরোধেও মিঃ হেলালী বন্দীদের মুক্তি দেননি এবং সরাইখানা থেকে উদ্ধারকৃত মাল যা কান্দাই পুলিশ অফিসের গুদামে আটক করা হয়েছে তা ফেরত দেওয়ায় তিনি অস্বীকার করেছেন।

কথাটা শুধু অশোভনীয় বা অস্বাভাবিক শোনালো না, একেবারে বিস্ময়কর শোনালো, কারণ আজ পর্যন্ত কোনো কর্মচারীর এমন সৎ সাহস হয়নি কর্মকর্তাদের কথা অবহেলা করেন।

মিঃ জায়েদীও মিঃ হেলালীর পথ অনুসরণ করেছেন। অন্যায় তাঁরা করবেন না, অন্যায়কে তাঁরা প্রশ্রয়ও দেবেন না বরং অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁরা প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন। এতে চাকরি থাকুক কিংবা যাক তাতে কিছু যায় আসে না।

শপথ গ্রহণ করেছেন কান্দাই পুলিশ প্রধান এবং মিঃ হেলালী।

কিন্তু পরদিন দেখা গেলো মিঃ জায়েদী এবং মিঃ হেলালী উধাও হয়েছেন। এরা কোথায় গেলেন কেউ জানেন না। তাঁদের স্থানে যাঁরা কাজে নামলেন, মানে যাঁদের হাতে চার্জ এলো তার হুকুম পাওয়ামাত্র কর্মকর্তাদের মেনে নিলেন, এ ছাড়া উপায় নেই কিছু।

মিঃ জায়েদী এবং মিঃ হেলালীর নিরুদ্দেশ নিয়ে কোনো তোলপাড় হলো না, কারণ এর পিছনে ছিলো অদৃশ্য হস্তের নিপুণ ইংগিত।

অবশ্য কানাকানি চলেছিলো এখানে সেখানে। মিঃ জায়েদী ও মিঃ হেলালীকে নিয়ে কিন্তু প্রকাশ্য কেউ কোনো আলাপ আলোচনা করতে পারেননি।

সৎ ও মহৎ ব্যক্তি ছিলেন বলে মিঃ জায়েদী এবং মিঃ হেলালীর সুনাম ছিলো, তাই অনেকেই গোপনে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন কিন্তু অতি সন্তর্পণে, যদি কোনো মহাপরিচালক জানতে পারেন তাহলে তার চাকরি তো যাবেই শেষে অনেক সাধের মাথাটাও হয়তো যাবে। দেশদ্রোহী হিসেবে তাকে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করা হবে। কাজেই কেউ কোনো কথা না বলে চুপ থাকাই বাঞ্ছনীয় মনে করলেন।

কিন্তু সবার মনে এক প্রশ্ন, এই দুই মহান ব্যক্তি গেলেন কোথায়?

❑

মিঃ জায়েদী, মিঃ হেলালী যখন তাঁদের অফিসরুমে বসে কোনো একটা কাজ করছিলেন তখন একটা জীপগাড়ি এসে থামলো। চারজন লোক, হাতে তাদের আগ্নেয়াস্ত্র। পুলিশ গার্ড টু শব্দ করলো না, কারণ যারা এলো তারা অপরিচিত জন নয়, তারা হলো নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির নিজস্ব লোক। এরাই নাকি আজকাল দেশরক্ষা করে চলেছে বলেই জনসাধারণ মনে করেন, সেই কারণে পুলিশ এদের কাজে উৎসাহ না যুগিয়ে পারেন না, অবশ্য কতকটা অনিচ্ছাসত্ত্বেও বটে।

চার ব্যক্তি দৃঢ় পদক্ষেপে অফিসরুমে প্রবেশ করে সোজা জায়েদী এবং হেলালী সাহেবের সম্মুখে এসে দাঁড়ায়। কঠিন কণ্ঠে বলে একজন—এক্ষুণি চলুন আপনারা।

মিঃ জায়েদী বললেন— কোথায়?

গিয়েই দেখবেন, চলুন।

পুলিশ প্রধানও এদের কাছে কলের পুতুলসম, কারণ এরাই এখন সরকারি হর্তাকর্তা-বিধাতাদের চাবিকাঠি।

পুলিশ প্রধান মিঃ জায়েদী ও হেলালী বিনাবাক্যে অনুসরণ করলেন ঐ চারজনকে।

অদূরে জীপগাড়ি দাঁড়িয়েছিলো।

চার ব্যক্তি চারপাশে ঘিরে জীপগাড়িতে উঠিয়ে নিলো মিঃ জায়েদী ও মিঃ হেলালীকে। সবার সম্মুখে প্রকাশ্য দিবালোকে তাঁদেরকে নিয়ে যাওয়া হলো, তবু কেউ কোনো কথা উচ্চারণ করবার সাহস পেলো না কিংবা জানতে পারলো না, এই দু' মহৎ ভদ্র লোককে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

জীপখানা বেরিয়ে গেলো পুলিশ প্রধানের বাংলো থেকে।

আজও কেউ জানে না তাঁরা কোথায় কিভাবে আছে এবং কি অবস্থায় আছেন।

সেদিন মিঃ জায়েদী ও মিঃ হেলালীকে নিয়ে গাড়িখানা সোজা কান্দাই রাজধানীর পথ অতিক্রম করে জালানা বলে একটা জায়গায় এসে পৌঁছলো। জালানায় যে বাড়িখানার সম্মুখে জীপ থামলো সে বাড়িখানা হলো একটি পুরোন চুনবালি খসে পড়া, পোড়োবাড়ি বলা চলে।

মিঃ জায়েদী এবং মিঃ হেলালীকে নামানো হলো সেই বাড়িখানার সম্মুখে এবং তাঁদের দু'জনকে নিয়ে যাওয়া হলো অপরাধী ব্যক্তিদের মত আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে।

পোড়োবাড়ির একটি অন্ধকারময় কক্ষে নিয়ে আসা হলো তাঁদের। সেই অন্ধকারময় কক্ষমধ্যে তাঁদের উপর চললো নির্যাতন।

বয়স্ক ভদ্রলোক মিঃ জায়েদী সাহেব এ সবে মোটেই তাঁর অভিজ্ঞতা-ছিলো না, তিনি একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন।

নানাভাবে নির্যাতিত করা হলো দু'জন পুলিশ অফিসারকে এবং তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হলো নেতাদের কথা অমান্য করার প্রতিফল এই শাস্তি।

এখানেই শেষ নয় আরও পরিণতি আছে। যদি তাঁরা সভ্য সমাজে মানুষের মত বেঁচে থেকে চাকরি বজায় রেখে জীবিকা নির্বাহ করতে চান তাহলে শপথ গ্রহণ করে পুনরায় ফিরে যেতে পারেন এবং দেশের নেতৃস্থানীয় যারা তাঁদের নির্দেশ মেনে চলতে হবে।

মিঃ জায়েদী এবং মিঃ হেলালী নির্মম নির্যাতন সহ্য করেও সেই অন্যায় শপথ গ্রহণ করলেন না। তাঁরা দৃঢ়কণ্ঠে জানালেন, মৃত্যুকে তাঁরা হাসিমুখে গ্রহণ করবেন কিন্তু অন্যায় কাজে সমর্থন জানাতে পারবে না।

কাজেই মিঃ জায়েদী এবং হেলালী ছাড়া পেলেন না।

তাঁদের হাত এবং পা বেঁধে নির্মমভাবে লোহার রড্ দ্বারা প্রহার করা হতে লাগলো। বেচারী মহৎ ব্যক্তিদ্বয় এ অত্যাচার নীরবে হজম করে চললেন।

একদিন দু'দিন তিনদিন কেটে গেলো। প্রতিদিন সব সময় তাঁদের উপর অত্যাচার চললো একইভাবে একই নিয়মে একই কথার পরিপ্রেক্ষিতে।

তিন দিন গত হয়ে গেলো।

চতুর্থ দিন।

মিঃ হেলালী ও মিঃ জায়েদীকে কশাঘাতে জর্জরিত করে একটি লোহার থামের সঙ্গে বেঁধে লৌহশলাকা অগ্নিদগ্ধ করে তাঁদের চিরদিনের জন্য অন্ধ করে দেওয়া হবে।

সম্মুখে একটি অগ্নিকুন্ড জ্বালানো হলো। দুটি লৌহশলাকা তাতে ধরে রাখা হয়েছে, লাল গনগনে হবার সঙ্গে সঙ্গে মিঃ জায়েদী এবং মিঃ হেলালীর চোখে বিদ্ধ করা হবে সেই শলাকা দুটি।

সেই কক্ষমধ্যে উপস্থিত রয়েছে গুন্ডা সর্দার ইমরান এবং চোরা ব্যবসায়ী সর্দার রশিদ হায়দার আলী। এরা ছাড়া আরও কয়েকজন আছে, যারা শয়তান রশিদ হায়দারের নিজস্ব লোক।

মিঃ জায়েদী হতাশ হয়ে পড়েছেন, জীবনের আশা তিনি সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করেছেন। মিঃ হেলালীর কানে কিন্তু সদাসর্বদা প্রতিধ্বনি হচ্ছে সেই রাতে বনহুরের কথাগুলো, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, যা করতে হয় আমিই

করবো...কিন্তু কই; সে তো এলো না, বা কিছু করলো না। তবে কি বনহুর তাকে ধোঁকা দিয়েছে—না না, সে ধোঁকা দিতে পারে না......ধোঁকা দিতে পারে না সে.........

অন্ধকার কক্ষে লেলিহান অগ্নিশিখার রক্তাভ আলোতে কক্ষটা ভয়াবহ মনে হচ্ছিলো, আরও বেশি ভয়াবহ মনে হচ্ছিলো কক্ষমধ্যে যারা রয়েছে তাদের। চারপাশের দেয়ালে যে ছায়াগুলো নড়াচড়া করছিলো, সেগুলো যেন এক একটা দানব।

নিরীহ ভদ্রলোক মিঃ হেলালী এবং মিঃ জায়েদী দুষ্কৃতিকারীগণকে পাকড়াও করে জেলে বন্দী করেন, কিন্তু নিজ হস্তে কারও শাস্তি দিতে এঁরা অভ্যস্ত নন। আজকের এ অবস্থা তাঁদের জন্য বিস্ময়কর এবং যন্ত্রণাদায়ক। অবশ্য মিঃ হেলালী কান্তা বারে হিম্মৎ খাঁর হাতে বন্দী হয়ে কিছুটা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন কিন্তু মিঃ জায়েদী সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ এসব ব্যাপারে।

দেয়ালের ছায়াগুলোর দিকে তাকিয়ে তিনি শিউরে উঠছেন সাহস পাচ্ছেন না সত্যিকারের মানুষ নামধারী পশুগুলোর দিকে তাকাতে।

লেলিহান অগ্নিকুন্ডের মধ্যে লৌহশলাকা দুটো লাল হয়ে উঠেছে।

সম্মুখে দাঁড়িয়ে রশিদ হায়দার।

ইমরান তার পাশে।

একজন অনুচর দুটো তোয়ালে দিলে লৌহশলাকার পিছন অংশ ধরে আছে। নির্দেশ পাওয়ামাত্র অগ্নিকুন্ড থেকে তুলে নেবে শলাকা দুটো এবং প্রবেশ করিয়ে দেবে মিঃ হেলালী কিংবা মিঃ জায়েদীর চোখে।

আরও তিন-চারজন অনুচর দাঁড়িয়ে আছে, সবার মুখেই বিদ্রুপের হাসি। কঠিন কঠোর মুখোভাব, চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে।

ইমরান বাম হাতে প্রচণ্ড চড় বসিয়ে দিলো পুলিশ প্রধানের মুখে, সঙ্গে সঙ্গে অশ্লীল ভাষায় গালাগাল করে চললো। মিঃ জায়েদীর গালে চড় মেরেই মিঃ হেলালীকে প্রচণ্ডভাবে লাথি দিলো, তাকেও যা তা বলে গালাগাল করে চললো।

রশিদ হায়দার বললো—আর বিলম্ব নয়, এবার লৌহশলাকা তুলে আনো.........

মালিকের আদেশ পেয়েই লৌহশলাকা দুটো তুলে নিলো অনুচরটি।

ইমরান শলাকা দুটো অনুচরের হাত থেকে নেবার পূর্বে রশিদ হায়দারকে জানিয়ে দিল, তাঁর কথামত কাজ না করায় কান্দাই পুলিশ প্রধান ও তাঁর সহকারীকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হলো........

হাঁ, তাই জানিয়ে দিচ্ছি। নিশ্চয়ই তিনি এ ব্যাপারে উৎসুক হয়ে প্রতিক্ষা করছেন রাজধানীতে বসে। তাঁদের ইংগিত ছাড়া আমরা কি কোন কাজ করতে পারি। তাঁরাই যে দেশ রক্ষক.........

রক্ষক নয়, তাঁরাই হলেন ভক্ষক।

ইমরান লৌহশলাকাসহ হাত দু'খানা মিঃ জায়েদীর চোখের সম্মুখে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো, ঠিক ঐ মুহূর্তে পিছনে অপরিচিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে একই সঙ্গে তাকায় সবাই পিছনে—সঙ্গে সঙ্গে ভূত দেখার মত আঁতকে উঠে তারা।

জমকালো পোশাকপরা একটি বলিষ্ঠ লোক স্টেনগান হাতে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

অগ্নিকুন্ডের লেলিহান শিখার লাল আলোতে তাকে অদ্ভুত বিস্ময়কর দেখাচ্ছে। শিউরে উঠলো কক্ষমধ্যে সবাই।

রশিদ হায়দার বললো—কে তুমি?

যদিও রশিদ হায়দারের কণ্ঠ বাকশক্তিহীন হয়ে পড়েছিলো তবু কথাটা যন্ত্রচালিতের মত উচ্চারণ করলো সে।

জমকালো মূর্তিটাকে লক্ষ্য করে মিঃ হেলালীর চোখ দুটো আনন্দোজ্জ্বল হয়ে উঠে, অস্ফুট কণ্ঠে তিনি বলেন—দস্যু বনহুর!

এ্যাঁ.........রশিদ হায়দার শব্দ করে উঠলো।

ইমরানের হাত থেকে লৌহশলাকা দুটো খসে পড়ে গেলো। বনহুরকে সে কোনোদিন চোখে না দেখলেও তার সম্বন্ধে শুনে শুনে তাকে না দেখেও আন্দাজে চিনে নিতে ভুল হয় না তার।

রশিদ হায়দার ইমরানকে লক্ষ্য করে বলে—এখন উপায়?

ইমরান কিছু বলবার পূর্বেই বলে উঠে বনহুর—উপায় মৃত্যু! তোমরা এক কদম নড়বে না। ষ্টেনগান তাদের দিকে উদ্যত রেখে বলে আমার— রশিদ হায়দার, খুলে দাও পুলিশ অফিসারদ্বয়ের হাত এবং পায়ের বাঁধন। যাও বিলম্ব করো না।

ঢোক গিললো রশিদ হায়দার।

ইমরান ও অন্যান্য শয়তান এ ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে।

বনহুর গর্জে উঠলো— যে পাপ তোমরা করেছো তার প্রায়শ্চিত্ত করো— হাঁ, তার পূর্বে ফোনে জানিয়ে দাও তোমাদের মৃত দেহগুলো যেন এই পোড়োবাড়ি থেকে রাজধানীতে নিয়ে যাও হয়। খুলে দাও সম্মানিত ব্যক্তিদের হাতের বাঁধন।

রশিদ হায়দার এবং ইমরান ব্যস্ত অথচ ভয়কম্পিত হস্তে মিঃ জায়েদী ও মিঃ হেলালীর দেহের বন্ধন মুক্ত করে দেয়। না দিয়ে তো কোনো উপায় ছিলো না, তাই বাধ্য হয়ে খুলে দিলো পুলিশ অফিসারদ্বয়ের হাত-পার শিকল।

বনহুর বললো—আপনারা এদিকে আসুন!

মিঃ জায়েদীর দু'চোখে রাজ্যের বিস্ময় ফুটে উঠেছে, তিনি কোনোদিন বনহুরকে স্বচক্ষে দেখেনি, শুধু বনহুর সম্বন্ধে তিনি জানেন এবং তাকে গ্রেপ্তারের জন্য কান্দাই পুলিশমহলকে বারবার নির্দেশ দিয়েছেন। সেই দস্যু বনহুর এই মুহূর্তে তাঁদের শুধু চক্ষুদানই করলো না, জীবনও রক্ষা করলো।

মিঃ হেলালীর চোখেমুখে আনন্দদ্যুতি খেলে যায়। এক নিমিশে ভুলে গেলো তিনি নির্যাতনের সব ব্যথা, বেদনা, দীপ্ত উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলেন—স্যার, বিপদ আমাদের কেটে গেছে—চলুন, ওপাশে চলুন।

মিঃ হেলালী মিঃ জায়েদীর হাত ধরে নিয়ে আসে দস্যু বনহুরের পাশে।

তিনি নির্বাক নয়নে দেখছেন বনহুরকে।

বনহুরের সম্পূর্ণ মুখমণ্ডল যদিও দেখা যাচ্ছে না তবু তিনি বিস্ময়ভরা চোখে দেখছেন, এই দস্যু বনহুরকে তিনি গ্রেপ্তার করার জন্য মিঃ

জাফরীর সঙ্গে একজোট হয়ে কাজ করেছেন এবং এখনও করে আসছেন। চৌধুরীবাড়ির উপর রয়েছে কড়া পাহাড়ার ব্যবস্থা। যাকে গ্রেপ্তার ব্যাপারে এখনও দু'লক্ষ টাকা ঘোষণা করা আছে.........

মিঃ জায়েদীর চিন্তাজাল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। দস্যু বনহুর বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠে—এক্ষুণি টেলিফোন করো রাজধানীর রিলিফ কমিটির প্রধানের কাছে.........

রশিদ হায়দার ঢোক গিলে বললো— কে, কে আপনি?

আমি যেই হইনা কেন আমার কথামত কাজ করো।

বুঝেছি আপনি—তুমি, তুমিই দস্যু বনহুর.........

হাঁ এবং এসেছি তোমাদের কর্মফলের পুরস্কার দিতে।

রশিদ হায়দার এবং ইমরানের মুখ দস্যু বনহুরের নাম শুনে যেমন ফ্যাকাশে হলো তেমনি ক্রু এবং হিংস্র হয়ে উঠলো, তবু বাধ্য হলো রশিদ হায়দার রিসিভার হাতে তুলে নিতে।

বনহুর বললো—রিলিফ প্রধানকে জানিয়ে দাও, ভাগ্যহত মানুষের মুখের গ্রাস আত্নসাৎ করার অপরাধে আমাদের শেষ পরিণতি কি হলো, একবার নিজে এসে দেখে যান.........বলো আমি যা বললাম, ঠিক ঐভাবে বলো।

রশিদ হায়দার দাঁতে দাঁত পিষে তাকালো দস্যু বনহুরের দিকে।

ইমরান ও তার দলবল সবাই তাকিয়ে আছে। সুযোগের অপেক্ষা করছে এক মুহূর্ত বনহুরের ষ্টেনগান হস্তচ্যুত হলে তারা তাকে দেখে নেবে এই তাদের মনোভাব। কিন্তু বনহুর সজাগভাবে ষ্টেনগান বাগিয়ে ধরে আছে, কোনো সময় অসতর্ক হচ্ছে না বা হবেও না কোনো মুহূর্তে।

বনহুর কঠিন কণ্ঠে বললো—বলো আমি যে কথাগুলো তোমাকে বললাম। হাঁ, আরও জানিয়ে দাও তোমাদের ঠিকানাটা, কারণ মহামান্য রিলিফ প্রধান কোথায় কোন্ ঠিকানায় আসবেন তাও জানিয়ে দাও.........চুপ করে আছো কেনো বলো......বলো না হলে এই মুহূর্তে তোমাদের শেষ পরিণতি দেখতে পাবে.........

রশিদ হায়দার তাকালো বনহুরের হাতে ষ্টেনগানের দিকে, তারপর কম্পিত গলায় রিলিফ প্রধানের কাছে ফোন করলো। বনহুর পুনরায় কথাগুলো উচ্চারণ করলো।

রশিদ হায়দার যখন ফোন করছিলো তখন তার হাত সহ গলা কাঁপছিলো ভীষণভাবে।

রিলিফ প্রধান বুঝতে পারেন এবং তৎক্ষণাৎ কান্দাই পুলিশ অফিসে ফোন করেন। তারা যেন ঐ মুহূর্তে পুলিশবাহিনী নিয়ে রশিদ হায়দার ও তার সহকর্মীদের উদ্ধার করে।

রশিদ হায়দার ফোন ছেড়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে দস্যু বনহুর বলে উঠে—কাগজ কলম নিয়ে লিখো, দুঃস্থ মানুষের গ্রাস কেড়ে নেবার অপরাধে আমরা এই শাস্তি গ্রহণ করলাম........নাও লিখো, যা বললাম সেই কথাগুলো লিখো........

রশিদ হায়দার ইতস্ততঃ করছিলো, ইমরান ড্রয়ার খুলে বের করে একখণ্ড কাগজ। রশিদ হায়দারের হাতে দেয় সে কাগজ আর কলম।

মিঃ জায়েদী এবং মিঃ হেলালী কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁদের চোখেমুখে বিস্ময়। একি তাঁরা স্বপ্ন দেখছেন না বাস্তব।

ইমরান রশিদ হায়দারের হাতে কাগজ আর কলম দিয়ে সরে দাঁড়ালো। রশিদ হায়দার অনিচ্ছা সত্ত্বেও লিখতে শুরু করেছে। ঠিক ঐ মুহূর্তে ইমরান বনহুরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

বনহুর এক দণ্ডের জন্য অন্যমনস্ক হয়নি। সে জানতো এরাও কম নয়—এক একজন গুণ্ডা সর্দার, কাজেই সে প্রতিক্ষণে প্রস্তুত হয়ে প্রতীক্ষা করছিলো, যে কোনো মুহূর্তে ওরা তাকে আক্রমণ করতে পারে।

ইমরান ঝাঁপিয়ে পড়ে ষ্টেনগান কেড়ে নেবার চেষ্টা করলো কিন্তু বনহুরের প্রচণ্ড এক ধাক্কায় ছিটকে পড়লো সে অগ্নিকুণ্ডটার পাশে।

রশিদ হায়দার ততক্ষণে শব্দগুলো লিখে শেষ করে নিয়েছিলো, মাত্র কটি কথা তাই লিখতে বিলম্ব হয়নি। অবশ্য রশিদ হায়দারও তেমনি এক অভিসন্ধি খুঁজছিলো কোনোক্রমে বনহুরকে পরাজিত করে তারা পালাবে, কিন্তু সে সুযোগ বনহুর তাদের দেয়নি।

ইমরান বনহুরের কাছে প্রচন্ড ধাক্কা খেয়ে অগ্নিকুন্ডের পাশে মুখ থুবড়ে পড়েই আবার উঠে দাঁড়ালো।

রশিদ হায়দার এবার অন্যপথ অবলম্বন করলো, শক্তির দ্বারা দস্যু বনহুরকে কাবু করা সম্ভব নয়, কাজেই সে ছুটে এসে দু'হাতে বনহুরের পা দু'খানা চেপে ধরলো—মাফ করে দাও, আর কোনোদিন এমন কাজ করবো না। দুঃস্থ মানুষের মুখের আহার কেড়ে নিয়ে সীমান্তের ওপারে চালান করবো না—এই কান ধরে বলছি.........

বনহুর অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো। হাসি যেন তার থামতে চায় না। তারপর বললো—মাফ করবো আমি.........না, কোনোদিনই তোমাদের মত অপরাধী মাফ পাবে না। শুধু তোমরা নও, যারা দেশের সর্বনাশ করে চলেছে, দেশের খাদ্যশস্য দেশের বাইরে পাচার করছে কিংবা পাচারে সাহায্য করছে তারা কেউ মাফ পাবে না, কারণ এরা খুনীর চেয়েও বেশি অপরাধী.........বনহুরের কথা শেষ হবার পর মুহূর্তেই তার হাতের ষ্টেনগান গর্জে উঠলো, শুরু হলো ব্রাশ ফায়ার।

রশিদ হায়দার ও ইমরানের সঙ্গে যারা ছিলো তারাও সবাই ঝাঁঝরা হয়ে গেলো বনহুরের ষ্টেনগানের গুলীতে।

একটা আর্তনাদ করবার সুযোগ কেউ পেলো না। কয়েকজন শয়তানের রক্তাক্ত দেহ ছড়িয়ে পড়ে রইলো অন্ধকার কক্ষের অগ্নিকুন্ডলির পাশে।

রশিদ হায়দার একেবারে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো অগ্নিকুন্ডের মাঝখানে, ওর দেহটাও জ্বলতে লাগলো দাউ দাউ করে।

বনহুর এবার বললো মিঃ জায়েদী এবং মিঃ হেলালীকে লক্ষ্য করে—আপনারা এবার ফিরে যান নিজ নিজ কর্মস্থানে। মনে রাখবেন ন্যায় চিরদিন অক্ষয়—অন্যায় কোনোদিন টিকে থাকতে পারে না।

হতভম্ব মিঃ জায়েদী এবং মিঃ হেলালী, তারা যেন ভাষা হারিয়ে ফেলেছেন। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাচ্ছেন বনহুরের দিকে।

বনহুর দু'জনকে অভিবাদন জানিয়ে বেরিয়ে গেলো, যেমন এসেছিলো সে দেবদূতের মত তেমনি স্বচ্ছন্দ গতিতে।

অল্পক্ষণেই পুলিশফোর্সসহ মিঃ জাফরী এসে হাজির হলেন। সমস্তদ বাড়িখানা পুলিশ ফোর্স ঘিরে ফেললো। কয়েকজন পুলিশ অফিসারসহ মিঃ জাফরী প্রবেশ করলেন পোড়ো বাড়িখানার ভিতরে।

মিঃ জাফরীকে রিলিফ প্রধান জানিয়েছেন, এই মুহূর্তে হাজলা অঞ্চলে এত নম্বর পোড়োবাড়িখানা ঘেরাও করে ফেলুন, সেখানে কোনো দৃষ্কৃতিকারী আত্নগোপন করে আছে এবং কোনো অপকর্ম করছে বলে আমি সংবাদ পেয়েছি।

নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির ফোন পেয়ে নীরব থাকার উপায় নেই কারও তাই মিঃ জাফরী কয়েকজন পুলিশ অফিসার এবং পুলিশ ফোর্সসহ সোজা হাজলায় চলে এলেন।

মিঃ জাফরীর নির্দেশমত সমস্ত পোড়াবাড়িখানা ঘেরাও করে ফেলা হলো। মিঃ জাফরী কয়েকজন পুলিশ অফিসার সহ ভিতরে প্রবেশ করলেন। অনেকগুলো ভাঙ্গা ও ধ্বসেপড়া ঘর অতিক্রম করে এগুতেই তাঁদের নজরে পড়লো মিঃ হেলালী মিঃ জায়েদীকে ধরে ধরে নিয়ে আসছেন। তাঁদের অবস্থা একেবারে নাজেহাল, মলিন রক্তাক্ত।

মিঃ জাফরী এবং তার সঙ্গীরা ভাবতেও পারেননি এখানে মিঃ জায়েদী আর মিঃ হেলালীকে দেখবেন। মিঃ জাফরী ও তাঁর সঙ্গীরা এক রকম প্রায় ছুটেই গেলেন তাঁদের পাশে।

মিঃ জাফরী মিঃ জায়েদীকে জড়িয়ে ধরে ব্যথাকরুণ অথচ আনন্দপূর্ণ কণ্ঠে বললেন—মিঃ জায়েদী, আপনারা বেঁচে আছেন? আপনাদের এই বাড়িতে বন্দী করে রাখা হয়েছিলো? মিঃ হেলালীকে তিনি সস্নেহে কথাগুলো বললেন।

মিঃ জায়েদী এবং মিঃ হেলালী সব কথা বললেন এবং ভিতরে গিয়ে দেখার জন্য অনুরোধ জানালেন।

মিঃ জাফরী দলবল সহ সেই অন্ধকার কক্ষে প্রবেশ করে হতবাকস্তম্ভিত হলেন। তখনও অগ্নিকুন্ডটা দপদপ করে জ্বলছে। অগ্নিকুন্ডের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে রশিদ হায়দারের প্রাণহীন দেহটা। কক্ষমধ্যে একটা

উৎকট গন্ধের সৃষ্টি হয়েছে, রশিদ হায়দারের দেহটা জ্বলছে এ তারই গন্ধ। আরও অনেকগুলো রক্তাক্ত দেহ ছড়িয়ে আছে কক্ষটির মধ্যে।

বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেলেন মিঃ জাফরী এবং তাঁর সঙ্গীরা। রক্তে লালে লাল হয়ে গেছে সমস্ত মেঝেটা। একটা যুদ্ধক্ষেত্র বলে মনে হচ্ছে কক্ষটাকে।

অগ্নিশিখার আলোতে পুলিশ অফিসারগণ নির্যাতিত পুলিশ অফিসারদ্বয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন অবাক চোখে।

কিছুতেই যেন তাঁরা বুঝে উঠতে পারছেন না। এ তাঁরা কি দেখছেন— সব যেন গভীর রহস্যময় মনে হচ্ছে তাদের কাছে।

মিঃ জায়েদী সংক্ষেপে কিছু বললেন এবং আরও বললেন, আমরা একটু সুস্থ হয়ে সব কিছু জানাবো। রশিদ হায়দারের শেষ চিঠিখানা তিনি তুলে নিয়ে মিঃ জাফরীর হাতে দিলেন।

মিঃ জাফরী রশিদ হায়দারের চিঠিখানা পড়ে আরও অবাক হলেন। কিন্তু তখন তিনি মিঃ জায়েদী এবং মিঃ হেলালীকে কিছু প্রশ্ন করা সমীচীন মনে করলেন না।

লাশগুলো পুলিশ ভ্যানে তুলে নেবার নির্দেশ দিয়ে মিঃ জায়েদী এবং মিঃ হেলালীকে তাঁদের গাড়িতে উঠিয়ে নিলেন মিঃ জাফরী। ফিরে চললেন কান্দাই পুলিশ অফিসে।

❑

স্বামীর জামার বোতামগুলো লাগিয়ে দিয়ে বললো মনিরা—এমনি করে চোরের মত আর কতদিন আসবে বলো? কোনোদিন তোমাকে কি নিশ্চিন্তভাবে পাবো না?

হয়তো পাবে না মনিরা, কারণ তুমি সবই জানো। লক্ষ্মীটি মন খারাপ করো না। এ পৃথিবীর সবাইতো স্বাভাবিকভাবে ঘর-সংসার করে আসছে— স্বামী, ছেলেমেয়ে আত্মীয়স্বজন নিয়ে। একইভাবে একই নিয়মে দিন কাটছে

সবার। তোমার শুধু ব্যতিক্রম, মনিরা এ হয়তো তোমার জীবনের চরম এক অভিশাপ.........

না না, ও কথা তুমি বলো না। অভিশাপ হতে যাবে কেনো, এ আমার জীবনের.........

বলো, বলো থামলে কেন?

আমার জীবনের নতুন এক আস্বাদ.........

মনিরা! বনহুর নিবিড়ভাবে বুকে জড়িয়ে ধরে ওকে আবেগভরা কণ্ঠে বলে—মনিরা, তুমি আমার জীবনের পরম এক সম্পদ। আমার প্রেরণা, আমার জীবনের উৎস......

আর তুমি বুঝি আমার কেউ নও, কিছু নও।

জানি সব জানি মনিরা। তুমি যে আমাকে কত ভালবাসো জানি কিন্তু আমি অপরাধী, তোমার কাছে আমি পাপী.........

স্বামীর মুখে হাতচাপা দেয় মনিরা—ছিঃ ও কথা বলো না— তুমি আমার স্বপ্ন, আমার সাধনা।

মনিরা, একটা কথা তোমাকে বলা আমার নিতান্ত প্রয়োজন কিন্তু কোনোদিন তুমি শুনলে না। যে কথার জন্য আমি অহরহঃ নিজকে তোমার পাশে অপরাধী মনে করি, সে কথা শোনার পর তুমি হয়তো আমাকে ক্ষমা করতে পারবে না।

থাক অমন কথা আমি শুনতে চাই না। যে কথা আমার মনকে ব্যথা দেবে সে কথা তুমি আমাকে বলো না। তুমি যে আমার, ওগো শুধু আমার......এই আমার একান্ত কামনার......বনহুরের বুকে মুখ লুকিয়ে মনিরা স্বামীকে একান্তভাবে অনুভব করে।

হঠাৎ দেয়ালঘড়িটা ঢং ঢং করে রাত চারটা ঘোষণা করে।

বনহুর সজাগ হয়ে উঠে। মনিরার মুখখানা তুলে ধরে বলে— চলি মনিরা, রাত শেষ হয়ে এসেছে......

মনিরা নিদ্রাজড়িত আঁখি দুটি তুলে ধরে স্বামীর মুখে। ধীরে ধীরে জামার আস্তিন ওর মুঠা থেকে খুলে নিয়ে দাঁড়ায় বনহুর।

পিছন জানালার শার্শী দিয়ে নেমে যায় বনহুর নিচে।

মনিরা দু'হাত তুলে বলে— হে রাহমানুর রহিম, তুমি ওকে সর্বদা বিপদ থেকে রক্ষা করো.........

মনিরার কানে ভেসে আসে অশ্বপদ শব্দ। সে বুঝতে পারে তাজের পিঠে তার স্বামী বিদায় নিয়ে চলে গেলো।

ফিরে আসে মনিরা বিছানায়, একটু পূর্বে যে জায়গায় শুয়েছিলো বনহুর, সেই জায়গায় হাত বুলিয়ে স্বামীর অস্তিত্ব অনুভব করে অন্তর দিয়ে। বড় সাধ হয় সদাসর্বদা স্বামীকে পাশে ধরে রাখে, কিন্তু তা কোনোদিনই পূরণ হবার নয়। মনিরার কাছে স্বামী যেন এক অপূর্ব সম্পদ—যত দেখে ততই যেন আরও ওকে দেখতে ইচ্ছে করে, যত স্পর্শ করে ততই যেন আরও স্পর্শ করতে মন চায়, মন চায় কাছে কাছে থাকতে......... ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ে মনিরার গন্ড বেয়ে।

বনহুর ততক্ষণে শহরের নির্জন পথ ধরে উল্কাবেগে আস্তানার দিকে ফিরে চলেছে।

পাহারাদার পুলিশমহল সজাগ হয়ে উঠে, হুইসেল দেয় পর পর সবাই একের পর এক এক করে। তাদের ভারী বুটের শব্দ পাথুরিয়া পথে এক অদ্ভুত আওয়াজ সৃষ্টি করে।

❑

তাজের পিঠ থেকে নেমে দাঁড়ায় বনহুর।

দু'জন অনুচর তাজকে ধরে ফেলে, বনহুর প্রবেশ করে আস্তানার মধ্যে আর অনুচরদ্বয় তাজকে নিয়ে যায় অশ্বশালার দিকে।

জাভেদ তখন তীরধনু হাতে বেরিয়ে যাচ্ছিলো, পিতাকে দেখে দাঁড়ায় সে, বলে—আব্বু দেখবে এসো আমি মস্তবড় একটা সাপ মারবো।

সাপ!

হাঁ, দেখবে এসো।

চলো।

বনহুর এগিয়ে যায় জাভেদের সঙ্গে।

আস্তানার বাইরে বেরিয়ে আসে বনহুর। গহন জঙ্গলের মধ্যে এগুতে থাকে পিতা পুত্র উভয়ে।

বেশ কিছুদূর আসার পর জাভেদ আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়—ঐ দেখো বড় একটা সাপ জটলা পাকিয়ে বসে আছে।

বনহুর বিস্ময় নিয়ে দেখে বিরাট একটা অজগর সাপ, একটা গাছের কোটরে বসে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

জাভেদ বললো—আব্বু, দেখো আমি এই মুহূর্তে সাপটাকে খতম করে দেবো।

বনহুর বললো—পারবে তো?

দেখো না আব্বু পারি কিনা? জাভেদ ধনুতে তীর সংযোগ করে নিক্ষেপ করলো সাপটার মাথা লক্ষ্য করে।

অবাক না হয়ে পারলো না বনহুর।

জাভেদের নিক্ষিপ্ত তীর গিয়ে বিদ্ধ হয়েছে ঠিক সাপটির মাথায়।

সাপটা যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করে উঠলো। কোটর থেকে বেরিয়ে এলো আঁকাবাঁকা হয়ে, ঝুলতে লাগলো ডালের সঙ্গে কিন্তু বেশিক্ষণ সাপটা ডালের সঙ্গে ঝুলতে পারলো না, ঝপাং করে পড়ে গেলো মাটিতে।

জাভেদের সেকি আনন্দ, তীরধনু রেখে দু'হাতে তালি দিয়ে নাচতে লাগলো। সাপটার মাথা ভেদ করে আছে তীরটা। বনহুর জাভেদকে তুলে নিলো কোলে, তারপর চুমুতে চুমুতে ভরিয়ে নিলো ওর গাল।

এমন সময় এসে বললো কায়েস—সর্দার, জম্বু থেকে রহমান ভাই সংবাদ পাঠিয়েছে আপনার সেখানে শিগ্‌গির যাওয়া দরকার।

হাঁ, অচিরেই আমি রওয়ানা দেবো। কায়েস, তুমি জাভেদকে আস্তানায় নিয়ে যাও। আমি দরবারকক্ষে যাচ্ছি, কিছু কাজ এখনও আমার বাকি আছে রাজধানীর বুকে।

কায়েস সর্দারের কোল থেকে জাভেদকে কোলে নিলো, তারপর চলে গেলো আস্তানার দিকে।

বনহুর দরবারকক্ষে প্রবেশ অনুচরদের ডাকলো এবং তাদের নিয়ে কিছুক্ষণ গভীরভাবে আলাপ-আলোচনা করলো। যখন ফিরে এলো বনহুর তখন অনেক বেলা হয়ে গেছে।

বিশ্রামকক্ষে প্রবেশ করে ক্লান্ত দেহটা এলিয়ে দিলো বনহুর বিছানায়।

নূরী চুপি চুপি এসে দাঁড়ালো তার শিয়রে। বললোনা কিছু, শুধু আঁচল দিয়ে বনহুরের কপালে সুড়সুড়ি দিলো সে।

চমকে উঠলো বনহুর।

নূরী খিল খিল করে হেসে ছুটে পালাতে যাচ্ছিলো কিন্তু বনহুর ওকে ধরে ফেললো।